অভাগীর স্বর্গ

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ঃ প্রাপ্তিস্থান ঃ

কামিনী প্রকাশালয়

১১৫, অখিল মিস্ত্রী লেন

কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রকাশক ঃ
শ্যামাপদ সরকার
১১৫, অখিল মিস্ত্রি লেন,
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

প্রথম কামিনী সংস্করণ ঃ
শুভ অক্ষয় তৃতীয়া— ১৩৬৯

প্রচ্ছদ শিল্পী ঃ
পার্থ প্রতিম বিশ্বাস

মুদ্রাকর ঃ
গোপীনাথ চক্রবর্তী
অবলা প্রেস
১/এ, গোয়াবাগান স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৬

অভাগীর স্বর্গ

॥ এক ॥

ঠাকুরদাস মুখুয্যের বর্ষীয়সী স্ত্রী সাতদিনের জ্বরে মারা গেলেন। বৃদ্ধ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ধানের কারবারে অতিশয় সঙ্গতিপন্ন। তাঁর চার ছেলে, তিন মেয়ে, ছেলেমেয়েদের ছেলেপুলে হইয়াছে, জামাইরা—প্রতিবেশীর দল, চাকর-বাকর—সে যেন একটা উৎসব বাধিয়া গেল। সমস্ত গ্রামের লোক ধুমধামের শবযাত্রা ভিড় করিয়া দেখিতে আসিল। মেয়েরা কাঁদিতে কাঁদিতে মায়ের দুই পায়ে গাঢ় করিয়া আলতা এবং মাথায় ঘন করিয়া সিন্দুর লেপিয়া দিল, বধূরা ললাট চন্দনে চর্চিত করিয়া বহুমূল্য বস্ত্রে শাশুড়ীর দেহ আচ্ছাদিত করিয়া দিয়া আঁচল দিয়া তাঁহার শেষ পদধূলি মুছাইয়া লইল। পুষ্পে, পত্রে, গন্ধে, মাল্যে, কলরবে মনে হইল না এ কোন শোকের ব্যাপার—এ যেন বড়বাড়ির গৃহিণী পঞ্চাশ বর্ষ পরে আর একবার নূতন করিয়া তাঁহার স্বামিগৃহে যাত্রা করিতেছেন। বৃদ্ধ মুখোপাধ্যায় শান্তমুখে তাঁহার চিরদিনের সঙ্গিনীকে শেষবিদায় দিয়া অলক্ষ্যে দু'ফোঁটা চোখের জল মুছিয়া শোকার্ত কন্যা ও বধূগণকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। প্রবল হরিধ্বনিতে প্রভাত-আকাশ আলোড়িত করিয়া সমস্ত গ্রাম সঙ্গে সঙ্গে চলিল। আর একটি প্রাণী একটু দূরে থাকিয়া এই দলের সঙ্গী হইল। সে কাঙালীর মা। সে তাহার কুটীর-প্রাঙ্গণের গোটা-কয়েক বেগুন তুলিয়া এই পথে হাটে চলিয়াছিল, এই দৃশ্য দেখিয়া আর নড়িতে পারিল না। রহিল তাহার হাটে যাওয়া, রহিল তাহার আঁচলে বেগুন বাঁধা—সে চোখের জল মুছিতে মুছিতে সকলের পিছনে শ্মশানে আসিয়া উপস্থিত হইল। গ্রামের একান্তে গরুড়-নদীর তীরে শ্মশান। সেখানে পূর্বাহ্ণেই কাঠের ভার, চন্দনের

টুকরা, ঘৃত, মধু, ধূপ, ধুনা প্রভৃতি উপকরণ সঞ্চিত হইয়াছিল, কাঙালীর মা ছোটজাত, তুলের মেয়ে বলিয়া কাছে যাইতে সাহস পাইল না, তফাতে একটা উঁচু ঢিপির মধ্যে দাঁড়াইয়া সমস্ত অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত উৎসুক আগ্রহে চোখ মেলিয়া দেখিতে লাগিল। প্রশস্ত ও পর্যাপ্ত চিতার পরে যখন শব স্থাপিত করা হইল তখন তাঁহার রাঙ্গা পা-দুখানি দেখিয়া তাহার দু'চক্ষু জুড়াইয়া গেল, ইচ্ছা হইল ছুটিয়া গিয়া একবিন্দু আলতা মুছাইয়া লইয়া মাথায় দেয়। বহুকণ্ঠের হরিধ্বনির সহিত পুত্র-হস্তের মন্ত্রপূত অগ্নি যখন সংযোজিত হইল তখন তাহার চোখ দিয়া ঝর-ঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল, মনে মনে বারংবার বলিতে লাগিল, ভাগ্যিমানী মা, তুমি সগ্যে যাচ্চো···আমাকেও আশীর্বাদ করে যাও, আমিও যেন এমনি কাঙালীর হাতের আগুনটুকু পাই। ছেলের হাতের আগুন! সে ত সোজা কথা নয়! স্বামী, পুত্র, কন্যা, নাতি, নাতনী, দাস, দাসী, পরিজন···সমস্ত সংসার উজ্জ্বল রাখিয়া এই যে স্বর্গারোহণ··· দেখিয়া তাহার বুক ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল,···এ সৌভাগ্যের সে যেন আর ইয়ত্তা করিতে পারিল না। সদ্য-প্রজ্জ্বলিত চিতার অজস্র ধুঁয়া নীল রঙের ছায়া ফেলিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া আকাশে উঠিতেছিল, কাঙালীর মা ইহারই মধ্যে ছোট একখানি রথের চেহারা যেন স্পষ্ট দেখিতে পাইল। গায়ে তাহার কত না ছবি আঁকা, চূড়ায় তাহার কত না লতাপাতা জড়ানো। ভিতরে কে যেন বসিয়া আছে···মুখ তাহার চেনা যায় না, কিন্তু সিঁথায় তাঁহার সিঁদুরের রেখা, পদতল-দুটি আলতায় রাঙানো। ঊর্ধ্বদৃষ্টে চাহিয়া কাঙালীর মায়ের দুই চোখে অশ্রুর ধারা বহিতেছিল, এমন সময়ে একটি বছর চোদ্দ-পনরর ছেলে তাহার আঁচলে টান দিয়া কহিল, হেথায় তুই দাঁড়িয়ে আছিস মা, ভাত রাঁধবি নে?

মা চমকিয়া ফিরিয়া চাহিয়া কহিল, রাঁধবো'খন রে! হঠাৎ উপরে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া ব্যগ্রস্বরে কহিল, ছাখ ছাখ বাবা,···বামুন-মা ওই রথে চড়ে সগ্যে যাচ্চে!

ছেলে বিস্ময়ে মুখ তুলিয়া কহিল, কৈ? ক্ষণকাল নিরীক্ষণ করিয়া শেষে বলিল, তুই ক্ষেপেছিস? ও ত ধুঁয়া! রাগ করিয়া কহিল, বেলা দুপুর বাজে, আমার ক্ষিদে পায় না বুঝি? এবং সঙ্গে সঙ্গে মায়ের চোখে জল লক্ষ্য করিয়া বলিল, বামুনদের গিন্নী মরছে তুই কেন কেঁদে মরিস মা?

কাঙালীর মার এতক্ষণে হুঁশ হইল। পরের জন্য শ্মশানে দাঁড়াইয়া এইভাবে অশ্রুপাত করায় সে মনে মনে লজ্জা পাইল, এমন কি, ছেলের অকল্যাণের আশঙ্কায় মুহূর্তে চোখ মুছিয়া ফেলিয়া একটুখানি হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, কাঁদব কিসের জন্যে রে! চোখে ধোঁ লেগেছে বৈ ত নয়!

হাঃ—ধোঁ লেগেছে বৈ ত না! তুই কাঁদতেছিলি!

মা আর প্রতিবাদ করিল না। ছেলের হাত ধরিয়া ঘাটে নামিয়া নিজেও স্নান করিল, কাঙালীকেও স্নান করাইয়া ঘরে ফিরিল—শ্মশান-সৎকারের শেষটুকু দেখা আর তার ভাগ্যে ঘটিল না।

॥ দুই ॥

সন্তানের নামকরণকালে পিতামাতার মূঢ়তায় বিধাতাপুরুষ অন্তরীক্ষে থাকিয়া অধিকাংশ সময়ে শুধু হাস্য করিয়াই ক্ষান্ত হন না, তীব্র প্রতিবাদ করেন। তাই তাহাদের সমস্ত জীবনটা তাহাদের নিজের নামগুলাকেই যেন আমরণ ভ্যাঙচাইয়া চলিতে থাকে। কাঙালীর মার জীবনের ইতিহাস ছোট, কিন্তু সেই ছোট্ট কাঙালজীবনটুকু বিধাতার এই পরিহাসের দায় হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছিল। তাহাকে জন্ম দিয়া মা মরিয়াছিল, বাপ রাগ করিয়া নাম দিল অভাগী। মা নাই, বাপ নদীতে মাছ ধরিয়া বেড়ায়, তাহার না আছে দিন, না আছে রাত। তবু যে কি করিয়া ক্ষুদ্র অভাগী একদিন কাঙালীর মা হইতে বাঁচিয়া রহিল সে এক বিস্ময়ের বস্তু। যাহার সহিত বিবাহ হইল তাহার নাম রসিক বাঘ, বাঘের অন্য বাঘিনী ছিল, ইহাকে লইয়া সে গ্রামান্তরে উঠিয়া গেল,

অভাগী তাহার অভাগ্য ও শিশুপুত্র কাঙালীকে লইয়া গ্রামেই পড়িয়া রহিল।

তাহার সেই কাঙালী বড় হইয়া আজ পনরয় পা দিয়াছে। সবেমাত্র বেতের কাজ শিখিতে আরম্ভ করিয়াছে, অভাগীর আশা হইয়াছে আরও বছরখানেক তাহার অভাগ্যের সহিত যুঝিতে পারিলে দুঃখ ঘুচিবে। এই দুঃখ যে কি, যিনি দিয়াছেন তিনি ছাড়া আর কেহই জানে না।

কাঙালী পুকুর হইতে আঁচাইয়া আসিয়া দেখিল তাহার পাতের ভুক্তাবশেষ মা একটা মাটির পাত্রে ঢাকিয়া রাখিতেছে, আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, তুই খেলি নে মা?

বেলা গড়িয়ে গেছে বাবা, এখন আর ক্ষিদে নেই।

ছেলে বিশ্বাস করিল না বলিল, না, ক্ষিদে নেই বৈ কি! কৈ, দেখি তোর হাঁড়ি?

এই ছলনায় বহুদিন কাঙালীর মা কাঙালীকে ফাঁকি দিয়া আসিয়াছে। সে হাঁড়ি দেখিয়া তবে ছাড়িল। তাহাতে আর একজনের মত ভাত ছিল। তখন সে প্রসন্নমুখে মায়ের কোলে গিয়া বসিল। এই বয়সের ছেলে সচরাচর এরূপ করে না, কিন্তু শিশুকাল হইতে বহুকাল যাবৎ সে রুগ্ন ছিল বলিয়া মায়ের ক্রোড় ছাড়িয়া বাহিরের সঙ্গী-সাথীদের সহিত মিশিবার সুযোগ পায় নাই। এইখানে বসিয়াই তাহাকে খেলাধূলার সাধ মিটাইতে হইয়াছে। একহাতে গলা জড়াইয়া মুখের উপর মুখ রাখিয়াই কাঙালী চকিত হইয়া কহিল, মা, তোর গা যে গরম, কেন তুই অমন রোদে দাঁড়িয়ে মড়া-পোড়ানো দেখতে গেলি? কেন আবার নেয়ে এলি? মড়া-পোড়ানো কি তুই—

মা শশব্যস্তে ছেলের মুখে হাত চাপা দিয়া কহিল, ছি বাবা, মড়া-পোড়ানো বলতে নেই, পাপ হয়। সতী-লক্ষ্মী মা-ঠাকুরুণ রথে করে সগ্যে গেলেন।

ছেলে সন্দেহ করিয়া কহিল, তোর এক কথা মা! রথে চড়ে কেউ নাকি আবার সগ্যে যায়!

মা বলিল, আমি যে চোখে দেখনু কাঙালী, বামুন-মা রথের উপরে বসে। তেনার রাঙা পা-দুখানি যে সবাই চোখ মেলে দেখলে রে!

সবাই দেখলে!

সব্বাই দেখলে।

কাঙালী মায়ের বুকে ঠেস দিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল। মাকে বিশ্বাস করাই তাহার অভ্যাস, বিশ্বাস করিতেই সে শিশুকাল হইতে শিক্ষা করিয়াছে, সেই মা যখন বলিতেছে সবাই চোখ মেলিয়া এতবড় ব্যাপার দেখিয়াছে, তখন অবিশ্বাস করিবার আর কিছু নাই। খানিক পরে আস্তে আস্তে কহিল, তা হলে তুইও ত মা সগ্যে যাবি? বিন্দির মা সেদিন রাখালের পিসীকে বলতেছিল, ক্যাঙ্‌লার মার মত সতী-লক্ষ্মী আর দুলে পাড়ায় নেই।

কাঙালীর মা চুপ করিয়া রহিল, কাঙালী তেমনি ধীরে ধীরে কহিতে লাগিল, বাবা যখন তোরে ছেড়ে দিলে, তখন তোরে কত লোকে ত নিকে করতে সাধাসাধি করলে। কিন্তু তুই বললি, না। বললি, কাঙালী বাঁচলে আমার দুঃখু ঘুচবে, আবার নিকে করতে যাবো কিসের জন্যে? হা মা, তুই নিকে করলে আমি কোথায় থাকতুম? আমি হয়ত না খেতে পেয়ে এতদিনে কবে মরে যেতুম।

মা ছেলেকে দুই হাতে বুকে চাপিয়া ধরিল। বস্তুতঃ, সেদিন তাহাকে এ পরামর্শ কম লোকে দেয় নাই, এবং যখন সে কিছুতেই রাজী হইল না, তখন উৎপাত-উপদ্রবও তাহার প্রতি সামান্য হয় নাই, সেই কথা স্মরণ করিয়া অভাগীর চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। ছেলে হাত দিয়া মুছাইয়া দিয়া বলিল, ক্যাতাটা পেতে দেব মা, শুবি?

মা চুপ করিয়া রহিল। কাঙালী মাদুর পাতিল, কাঁথা পাতিল, মাচার উপর হইতে ছোট বালিশটি পাড়িয়া দিয়া হাত ধরিয়া তাহাকে বিছানায় টানিয়া লইয়া যাইতে মা কহিল, কাঙালী, আজ তোর আর কাজে গিয়ে কাজ নেই।

কাজ কামাই করিবার প্রস্তাব কাঙালীর খুব ভাল লাগিল, কিন্তু

কহিল, জলপানির পয়সা দুটো ত তা হলে দেবে না মা!

না দিক গে,—আয় তোকে রূপকথা বলি।

আর প্রলুব্ধ করিতে হইল না, কাঙালী তৎক্ষণাৎ মায়ের বুক ঘেঁষিয়া শুইয়া পড়িয়া কহিল, বল্ তা হলে। রাজপুত্তুর কোটালপুত্তুর আর সেই পক্ষীরাজ ঘোড়া—

অভাগী রাজপুত্র, কোটালপুত্র আর পক্ষীরাজ ঘোড়ার কথা দিয়া গল্প আরম্ভ করিল। এ-সকল তাহার পরের কাছে কতদিনের শোনা এবং কতদিনের বলা উপকথা। কিন্তু মুহূর্তকয়েক পরে কোথায় গেল তাহার রাজপুত্র, আর কোথায় গেল তাহার কোটালপুত্র সে এমন উপকথা শুরু করিল যাহা পরের কাছে তাহার শেখা নয়—নিজের সৃষ্টি। জ্বর তাহার যত বাড়িতে লাগিল, উষ্ণ রক্তস্রোত যত দ্রুতবেগে মস্তিষ্কে বহিতে লাগিল, ততই সে যেন নব নব উপকথার ইন্দ্রজাল রচনা করিয়া চলিতে লাগিল। তাহার বিরাম নাই, বিচ্ছেদ নাই—কাঙালীর স্বল্প দেহ বার বার রোমাঞ্চিত হইতে লাগিল। ভয়ে, বিস্ময়ে, পুলকে সে সজোরে মায়ের গলা জড়াইয়া তাহার বুকের মধ্যে যেন মিশিয়া যাইতে চাহিল।

বাহিরে বেলা শেষ হইল, সূর্য অস্ত গেল, সন্ধ্যার ম্লান ছায়া গাঢ়তর হইয়া চরাচর ব্যাপ্ত করিল, কিন্তু ঘরের মধ্যে আজ আর দীপ জ্বলিল না, গৃহস্থের শেষ কর্তব্য সমাধা করিতে কেহ উঠিল না, নিবিড় অন্ধকারে কেবল রুগ্ন মাতার অবাধ গুঞ্জন নিস্তব্ধ পুত্রের কর্ণে সুধাবর্ষণ করিয়া চলিতে লাগিল। সে সেই শ্মশান ও শ্মশানযাত্রার কাহিনী। সেই রথ, সেই রাঙ্গা পা-দুটি, সেই তাঁর স্বর্গে যাওয়া! কেমন করিয়া শোকার্ত স্বামী শেষ পদধূলি দিয়া কাঁদিয়া বিদায় দিলেন, কি করিয়া হরিধ্বনি দিয়া ছেলেরা মাতাকে বহন করিয়া লইয়া গেল, তার পরে সন্তানের হাতের আগুন। সে আগুন ত আগুন নয় কাঙালী, সে ত হরি! তার আকাশ জোড়া ধুঁয়ো নয় বাবা, সেই ত সগ্যের রথ! কাঙালীচরণ, বাবা আমার!

কেন মা ?

তোর হাতের আগুন যদি পাই বাবা, রামুন-মার মত আমিও সগ্যে যেতে পাবো।

কাঙালী অস্ফুটে শুধু কহিল, যাঃ—বলতে নেই।

মা সে কথা বোধ করি শুনিতেও পাইল না, তপ্তনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিতে লাগিল, ছোটজাত বলে তখন কিন্তু কেউ ঘেন্না করতে পারবে না—দুঃখী বলে কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। ইস্! ছেলের হাতের আগুন—রথকে যে আসতেই হবে।

ছেলে মুখের উপর মুখ রাখিয়া ভগ্নকণ্ঠে কহিল, বলিস নে মা, বলিস নে, আমার বড্ড ভয় করে।

মা কহিল, আর দেখ্ কাঙালী, তোর বাবাকে ধরে আনবি, অমনি যেন পায়ের ধূলো মাথায় দিয়ে আমাকে বিদায় দেয়। অমনি পায়ে আলতা, মাথায় সিঁদুর দিয়ে,—কিন্তু কে বা দেবে? তুই দিবি, না রে ক্যাঙালী? তুই আমার ছেলে, তুই আমার মেয়ে, তুই আমার সব! বলিতে বলিতে সে ছেলেকে একেবারে বুকে চাপিয়া ধরিল।

॥ তিন ॥

অভাগীর জীবন-নাট্যের শেষ অঙ্ক পরিসমাপ্ত হইতে চলিল। বিস্তৃতি বেশী নয়, সামান্যই। বোধ করি ত্রিশটা বৎসর আজও পার হইয়াছে কি হয় নাই, শেষও হইল তেমনি সামান্য ভাবে। গ্রামে কবিরাজ ছিল না, ভিন্ন গ্রামে তাঁহার বাস। কাঙালী গিয়া কাঁদাকাটি করিল, হাতে-পায়ে পড়িল, শেষে ঘটি বাঁধা দিয়া তাঁহাকে একটাকা প্রণামী দিল। তিনি আসিলেন না, গোটা-চারেক বড়ি দিলেন। তাহার কত কি আয়োজন। খল, মধু, আদার সত্ত্ব, তুলসীপাতার রস—কাঙালীর মা ছেলের প্রতি রাগ করিয়া বলিল, কেন তুই আমাকে না বলে ঘটি বাঁধা দিতে গেলি বাবা? হাত পাতিয়া বড়ি কয়টি গ্রহণ করিয়া মাথায় ঠেকাইয়া উনানে ফেলিয়া

দিয়া কহিল, ভাল হই ত এতেই হব, বাগদী দুলের ঘরে কেউ কখনো ওষুধ খেয়ে বাঁচে না।

দিন দুই-তিন এমনি গেল। প্রতিবেশীরা খবর পাইয়া দেখিতে আসিল। যে যাহা মুষ্টিযোগ জানিত, হরিণের শিঙ-ঘষা জল, গেঁটে-কড়ি পুড়াইয়া মধুতে মাড়িয়া চাটাইয়া দেওয়া ইত্যাদি অব্যর্থ ঔষধের সন্ধান দিয়া যে যাহার কাজে গেল। ছেলেমানুষ কাঙালী ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিতে, মা তাহাকে কাছে টানিয়া লইয়া কহিল, কোবরেজের বড়িতে কিছু হল না বাবা, আর ওদের ওষুধে কাজ হবে? আমি এমনি ভাল হবো।

কাঙালী কাঁদিয়া কহিল, তুই বড়ি ত খেলি নে মা, উনুনে ফেলে দিলি। এমনি কি কেউ সারে?

আমি এমনি সেরে যাবো। তার চেয়ে তুই দুটো ভাতে-ভাত ফুটিয়ে নিয়ে খা দিকি, আমি চেয়ে দেখি।

কাঙালী এই প্রথম অপটু হস্তে ভাত রাঁধিতে প্রবৃত্ত হইল। না পারিল ফ্যান ঝাড়িতে, না পারিল ভাল করিয়া ভাত বাড়িতে। উনান তাহার জ্বলে না···ভিতরে জল পড়িয়া ধুঁয়া হয়; ভাত ঢালিতে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে; মায়ের চোখ ছলছল করিয়া আসিল। নিজে একবার উঠিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু মাথা সোজা করিতে পারিল না, শয্যায় লুটাইয়া পড়িল। খাওয়া হইয়া গেলে ছেলেকে কাছে লইয়া কি করিয়া কি করিতে হয় বিধিমতে উপদেশ দিতে গিয়া তাহার ক্ষীণকণ্ঠ থামিয়া গেল, চোখ দিয়া কেবল অবিরলধারে জল পড়িতে লাগিল।

গ্রামে ঈশ্বর নাপিত নাড়ী দেখিতে জানিত, পরদিন সকালে সে হাত দেখিয়া তাহারই সুমুখে মুখ গম্ভীর করিল, দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল এবং শেষে মাথা নাড়িয়া উঠিয়া গেল। কাঙালীর মা ইহার অর্থ বুঝিল, কিন্তু তাহার ভয়ই হইল না। সকলে চলিয়া গেলে সে ছেলেকে কহিল, এইবার একবার তাকে ডেকে আনতে পারিস বাবা?

কাকে মা?

ওই যে রে···ও-গাঁয়ে যে উঠে গেছে···

কাঙালী বুঝিয়া কহিল, বাবাকে ?

অভাগী চুপ করিয়া রহিল।

কাঙালী বলিল, সে আসবে কেন মা ?

অভাগীর নিজেরই যথেষ্ট সন্দেহ ছিল, তথাপি আস্তে আস্তে কহিল, গিয়ে বলবি, মা শুধু একটু তোমার পায়ের ধুলো চায়।

সে তখনি যাইতে উদ্যত হইলে সে তাহার হাতটা ধরিয়া ফেলিয়া বলিল, একটু কাঁদাকাটা করিস বাবা, বলিস মা যাচ্চে।

একটু থামিয়া কহিল, ফেরবার পথে অমনি নাপতে-বৌদির কাছ থেকে একটু আলতা চেয়ে আনিস ক্যাঙালী, আমার নাম করলেই সে দেবে। আমাকে বড় ভালবাসে।

ভাল তাহাকে অনেকেই বাসিত। জ্বর হওয়া অবধি মায়ের মুখে সে এই কয়টা জিনিসের কথা এতবার এতরকম করিয়া শুনিয়াছে যে, সে সেইখান হইতে কাঁদিতে কাঁদিতে যাত্রা করিল।

॥ চার ॥

পরদিন রসিক ডুলে সময়মত যখন আসিয়া উপস্থিত হইল তখন অভাগীর আর বড় জ্ঞান নাই। মুখের পরে মরণের ছায়া পড়িয়াছে, চোখের দৃষ্টি এ সংসারেব কাজ সারিয়া কোথায় কোন্ অজানা দেশে চলিয়া গেছে। কাঙালী কাঁদিয়া কহিল, মাগো! বাবা এসেছে—পায়ের ধুলো নেবে যে!

মা হয়ত বুঝিল, হয়ত বুঝিল না, হয়ত বা তাহার গভীর সঞ্চিত বাসনা সংস্কারের মত তাহার আচ্ছন্ন চেতনায় ঘা দিল। এই মৃত্যুপথ-যাত্রী তাহার অবশ বাহুখানি শয্যায় বাহিরে হাত পাতিল।

রসিক হতবুদ্ধির মত দাঁড়াইয়া রহিল। পৃথিবীতে তাহারও পায়ের ধুলার প্রয়োজন আছে, ইহাও কেহ নাকি চাহিতে পারে তাহার কল্পনার

অতীত। বিন্দির পিসী দাঁড়াইয়া ছিল, সে কহিল, দাও বাবা, দাও একটু পায়ের ধূলো।

রসিক অগ্রসর হইয়া আসিল। জীবনে যে স্ত্রীকে সে ভালবাসা দেয় নাই, অশন-বসন দেয় নাই, কোন খোঁজখবর করে নাই, মরণকালে তাহাকে সে শুধু একটু পায়ের ধূলা দিতে গিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

রাখালের মা বলিল, এমন সতীলক্ষ্মী বামুন-কায়েতের ঘরে না জন্মে ও আমাদের দুলের ঘরে জন্মালো কেন! এইবার ওর একটু গতি করে দাও বাবা – ক্যাঙলার হাতের আগুনের লোভে ও যেন প্রাণটা দিলে!

অভাগীর অভাগ্যের দেবতা অগোচরে বসিয়া কি ভাবিলেন জানি না, কিন্তু ছেলেমানুষ কাঙালীর বুকে গিয়া এ কথা যেন তীরের মত বিঁধিল।

সেদিন দিনের বেলাটা কাটিল, প্রথম রাত্রিটাও কাটিল, কিন্তু প্রভাতের জন্য কাঙালীর মা আর অপেক্ষা করিতে পারিল না। কি জানি, এত ছোটজাতের জন্যও স্বর্গে রথের ব্যবস্থা আছে কি না, কিংবা অন্ধকারে পায়ে হাঁটিয়াই তাহাদের রওনা হইতে হয়—কিন্তু এটা বুঝা গেল, রাত্রি শেষ না হইতেই এ দুনিয়া সে ত্যাগ করিয়া গেছে।

কুটীর-প্রাঙ্গণে একটা বেলগাছ, একটা কুড়ুল চাহিয়া আনিয়া রসিক তাহাতে ঘা দিয়াছে কি দেয় নাই, জমিদারের দরোয়ান কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া তাহার গালে সশব্দে একটা চড় কষাইয়া দিল: কুড়ুল কাড়িয়া লইয়া কহিল, শালা, একি তোর বাপের গাছ আছে যে কাটতে লেগেছিস?

রসিক গালে হাত বুলাইতে লাগিল, কাঙালী কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলিল, বাঃ, এ যে আমার মায়ের হাতে পোঁতা গাছ, দরোয়ানজী! বাবাকে খামোকা তুমি মারলে কেন?

হিন্দুস্থানী দরোয়ান তাহাকেও একটা অশ্রাব্য গালি দিয়া মারিতে গেল, কিন্তু সে নাকি তাহার জননীর মৃতদেহ স্পর্শ করিয়া বসিয়াছিল, তাই অশৌচের ভয়ে তাহার গায়ে হাত দিল না। হাঁকাহাঁকিতে একটা

ভিড় জমিয়া উঠিল, কেহই অস্বীকার করিল না যে বিনা অনুমতিতে রসিকের গাছ কাটিতে যাওয়াটা ভাল হয় নাই। তাহারাই আবার দরোয়ানজীর হাতে-পায়ে পড়িতে লাগিল, তিনি অনুগ্রহ করিয়া যেন একটা হুকুম দেন। কারণ, অসুখের সময় যে-কেহ দেখিতে আসিয়াছে কাঙালীর মা তাহারই হাতে ধরিয়া তাহার শেষ অভিলাষ ব্যক্ত করিয়া গেছে।

দরোয়ান ভুলিবার পাত্র নহে, সে হাত মুখ নাড়িয়া জানাইল, এ সকল চালাকি তাহার কাছে খাটিবে না।

জমিদার স্থানীয় লোক নহেন ; গ্রামে তাঁহার একটা কাছারি আছে, গোমস্তা অধর রায় তাহার কর্তা। লোকগুলো যখন হিন্দুস্থানীটার কাছে ব্যর্থ অনুনয় বিনয় করিতে লাগিল কাঙালী ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়িয়া একেবারে কাছারি বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইল। সে লোকের মুখে মুখে শুনিয়াছিল পিয়াদারা ঘুষ লয়, তাহার নিশ্চয় বিশ্বাস হইল অতবড় অসংগত অত্যাচারের কথা যদি কর্তার গোচরে করিতে পারে ত ইহার প্রতিবিধান না হইয়াই পারে না। হায় রে অনভিজ্ঞ! বাঙলাদেশের জমিদার ও তাহার কর্মচারীকে সে চিনিত না। সদ্যমাতৃহীন বালক শোকে ও উত্তেজনায় উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া একেবারে উপরে উঠিয়া আসিয়াছিলেন বিস্মিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, কে রে ?

আমি কাঙালী। দরোয়ানজী আমার বাবাকে মেরেছে।

বেশ করেচে। হারামজাদা খাজনা দেয়নি বুঝি ?

কাঙালী কহিল, না বাবুমশায়, বাবা গাছ কাটতেছিল, আমার মা মরেচে। বলিতে বলিতে সে কান্না আর চাপিতে পারিল না।

সকালবেলা এই কান্নাকাটিতে অধর অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। ছোড়াটা মড়া ছুইয়া আসিয়াছে, কি জানি এখানকার কিছু ছুইয়া ফেলিল নাকি! ধমক দিয়া বলিলেন, মা মরেচে ত যা নীচে নেবে দাঁড়া। ওরে কে আছিস রে এখানে একটু গোবরজল ছড়িয়ে দে। কি জাতের ছেলে তুই ?

কাঙালী সভয়ে প্রাঙ্গণে নামিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, আমরা তুলে।

অধর কহিলেন, তুলে! তুলের মড়ায় কাঠ কি হবে শুনি?

কাঙালী বলিল, মা যে আমাকে আগুন দিতে বলে গেছে। তুমি জিজ্ঞেস কর না বাবুমশায়, মা যে সবাইকে বলে গেছে সকলে শুনেছে যে! মায়ের কথা বলিতে গিয়া তাহার অনুক্ষণের সমস্ত অনুরোধ উপরোধ মুহূর্তে স্মরণ হইয়া কণ্ঠ যেন তাহার কান্নায় ফাটিয়া পড়িতে চাহিল।

অধর কহিলেন. মাকে পোড়াবি ত গাছের দাম পাঁচটা টাকা আন গে। পারবি।

কাঙালী জানিত তাহা অসম্ভব। তাহার উত্তরীয় কিনিবার মূল্যস্বরূপ তাহার ভাত খাইবার পিতলের কাঁসিটি বিন্দির পিসী একটি টাকায় বাঁধা দিতে গিয়াছে। সে চোখে দেখিয়া আসিয়াছে সে ঘাড় নাড়িল, বলিল না।

অধর মুখখানা অত্যন্ত বিকৃত করিয়া কহিলেন ,না ত, মাকে নিয়ে নদীর চড়ায় পুঁতে ফেলে গেলে যা। কার বাবার গাছে তোর বাপ কুড়ুল ঠেকাতে যায় পাজী হতভাগা নচ্ছার।

কাঙালী বলিল, সে যে আমাদের উঠানের গাছ বাবুমশায়। সে যে আমার মায়ের হাতে পোঁতা গাছ।

হাতে পোঁতা গাছ! পাঁড়ে, ব্যাটাকে গলাধাক্কা দিয়ে বার করে দে ত।

পাঁড়ে আসিয়া গলাধাক্কা দিল এবং এমন কথা উচ্চারণ করিল যাহা কেবল জমিদারের কর্মচারীরাই পারে।

কাঙালী ধূলা ঝাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, তার পরে ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল। কেন সে যে মার খাইল, কি তার অপরাধ ছেলেটা ভাবিয়াই পাইল না। গোমস্তার নির্বিকার চিত্তে দাগ পর্যন্ত পড়িল না। পড়িলে এ চাকরি, তাহার জুটিত না। কহিলেন, পরেশ দেখ ত হে এ ব্যাটার খাজনা বাকী পড়েছে কি না। থাকে ত জাল-টাল কিছু একটা

কেড়ে এনেযেন রেখে দেয়—হারামজাদা পালাতে পারে!

মুখুয্যে বাড়িতে শ্রাদ্ধের দিন—মাঝে কেবল একটা দিন মাত্র বাকী। সমারোহের আয়োজন গৃহিণীর উপযুক্ত করিয়াই হইতেছে। বৃদ্ধ ঠাকুরদাস নিজে তত্ত্বাবধান করিয়া ফিরিতেছিলেন, কাঙালী আসিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইল, কহিল, ঠাকুরমশাই আমার মা মরে গেছে।

তুই কে? কি চাস তুই?

আমি কাঙালী। মা বলে গেছে তোমাকে আগুন দিতে।

তা দি গে না।

কাছারির ব্যাপারটা ইতিমধ্যেই মুখে মুখে প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছিল, একজন কহিল ও বোধ হয় একটা গাছ চায়। এই বলিয়া সে ঘটনাটা প্রকাশ করিয়া কহিল।

মুখুয্যে বিস্মিত ও বিরক্ত হইয়া কহিলেন শোন আবদার। আমারই কত কাঠের দরকার,—কাল বাদে পরশু কাজ। যা যা এখানে কিছু হবে না—এখানে কিছু হবে না। এই বলিয়া অন্যত্র প্রস্থান করিলেন।

ভট্টাচার্য মহাশয় অদূরে বসিয়া ফর্দ করিতেছিলেন, তিনি বলিলেন, তোদের জেতে কে কবে আবার পোড়ায় রে? যা মুখে একটু নুড়ো জ্বেলে দিয়ে নদীর চড়ায় মাটি দে গে।

মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বড়ছেলে ব্যস্তসমস্তভাবে এই পথে কোথায় যাইতেছিলেন। তিনি কান খাড়া করিয়া একটু শুনিয়া কহিলেন, দেখচেন ভট্টচার্যমশায় সব ব্যাটারাই এখন বামুন-কায়েত হতে চায়। বলিয়া কাজের ঝোঁকে আর কোথায় চলিয়া গেলেন।

কাঙালী আর প্রার্থনা করিল না। এই ঘণ্টা দুয়েকের অভিজ্ঞতায় সংসারে সে যেন একেবারে বুড়া হইয়া গিয়াছিল। নিঃশব্দে ধীরে ধীরে তাহার মরা মায়ের কাছে গিয়া উপস্থিত হইল।

নদীর চরে গর্ত খুঁড়িয়া অভাগীকে শোয়ান হইল। রাখালের মা

কাঙালীর হাতে একটা খড়ের আঁটি জ্বালিয়া দিয়া তাহারই হাত ধরিয়া মায়ের মুখে স্পর্শ করাইয়া ফেলিয়া দিল। তার পরে সকলে মিলিয়া দিল।

সবাই সকল কাজে ব্যস্ত শুধু সেই পোড়া খড়ের আঁটি হইতে যে স্বল্প ধুয়াটুকু ঘুরিয়া ঘুরিয়া আকাশে উঠিতেছিল তাহারই প্রতি পলকহীন চক্ষু পাতিয়া কাঙালী ঊর্ধ্বদৃষ্টে স্তব্ধ হইয়া চাহিয়া রহিল।

———

হরিলক্ষ্মী

যাহা লইয়া এই গল্পের উৎপত্তি, তাহা ছোট ; তথাপি এই ছোট ব্যাপারটুকু অবলম্বন করিয়া হরিলক্ষ্মীর জীবনে যাহা ঘটিয়া গেল, তাহা ক্ষুদ্রও নহে, তুচ্ছও নহে। সংসারে এমনই হয়। বেলপুরের দুই শরিক, শান্ত নদীকূলে জাহাজের পাশে জেলেডিঙির মত একটি অপরটির পার্শ্বে নিরুপদ্রবেই বাঁধা ছিল, অকস্মাৎ কোথাকার একটা উড়ো ঝড়ে তরঙ্গ তুলিয়া জাহাজের দড়ি কাটিল, নোঙ্গর ছিঁড়িল, এক মুহূর্তে ক্ষুদ্র তরণী কি করিয়া যে বিধ্বস্ত হইয়া গেল, তাহার হিসাব পাওয়াই গেল না।

বেলপুর তালুকটুকু বড় ব্যাপার নয়। উঠিতে বসিতে প্রজা ঠেঙ্গাইয়া হাজার বারোর উপরে উঠে না, কিন্তু সাড়ে-পনর আনার অংশীদার শিবচরণের কাছে দু'পাই অংশের বিপিনবিহারীকে যদি জাহাজের সঙ্গে জেলে-ডিঙির তুলনাই করিয়া থাকি ত, বোধ করি অতিশয়োক্তির অপরাধ করি নাই।

দূর হইলেও জ্ঞাতি, এবং ছয়-সাত পুরুষ পূর্বে ভদ্রাসন উভয়ের একত্রই ছিল, কিন্তু আজ একজনের ত্রিতল অট্টালিকা গ্রামের মাথায় চড়িয়াছে এবং অপরের জীর্ণ গৃহ দিনের পর দিন ভূমিশয্যা গ্রহণের দিকেই মনোনিবেশ করিয়াছে।

তবু এমনই ভাবে দিন কাটিতেছিল এবং এমনই করিয়াই ত বাকী দিনগুলা বিপিনের সুখে-দুঃখে নির্বিবাদেই কাটিতে পারিত ; কিন্তু যে মেঘখণ্ডটুকু উপলক্ষ্য করিয়া অকালে ঝঞ্ঝা উঠিয়া সমস্ত বিপর্যস্ত করিয়া দিল তাহা এইরূপ।

সাড়ে-পনর আনার অংশীদার শিবচরণের হঠাৎ পত্নীবিয়োগ ঘটিলে বন্ধুরা কহিলেন, চল্লিশ-একচল্লিশ কি আবার একটা বয়স! তুমি আবার বিবাহ কর। শত্রুপক্ষীয়রা শুনিয়া হাসিল, কহিল, চল্লিশ ত শিবচরণের চল্লিশ বছর আগে পার হয়ে গেছে! অর্থাৎ, কোনটাই সত্য নয়. আসল কথা, বড়বাবুর দিব্য গৌরবর্ণ নাদুস-নুদুস দেহ, সুপুষ্ট মুখের পরে রোমের চিহ্নমাত্র নাই। যথাকালে দাড়িগোঁফ না গজানোর সুবিধা হয়ত কিছু আছে, কিন্তু অসুবিধাও বিস্তর। বয়স আন্দাজ করা ব্যাপারে যাহারা নীচের দিকে যাইতে চাহে না, উপরের দিকে তাহারা যে অঙ্কের কোন কোঠায় গিয়া ভর দিয়া দাঁড়াইবে, তাহা নিজেরাই ঠাহর করিতে পারে না। সে যাই হউক, অর্থশালী পুরুষের যে কোন দেশেই বয়সের অজুহাতে বিবাহ আটকায় না, বাঙলাদেশে ত নয়-ই। মাস দেড়েক শোকতাপও না না করিয়া গেল, তাহার পরে হরীলক্ষ্মীকে বিবাহ করিয়া শিবচরণ বাড়ি আনিলেন। শূন্যগৃহ এক-দিনেই যোলকলায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। কারণ, শত্রুপক্ষ যাহাই কেন না বলুক, প্রজাপতি যে সত্যিই তাঁহার প্রতি এবার অতিশয় প্রসন্ন ছিলেন, তাহা মানিতেই হইবে। তাহারা গোপনে বলাবলি করিল, পাত্রের তুলনায় নববধূ বয়সের দিক দিয়া একেবারেই যে বেমানান হয় নাই, তবে দুই একটি ছেলেমেয়ে সঙ্গে লইয়া ঘরে ঢুকিলে আর খুঁত ধরিবার কিছু থাকিত না! তবে সে যে সুন্দরী, এ কথা তাহারা স্বীকার করিল। ফল কথা সচরাচর বড় বয়সের চেয়েও লক্ষ্মীর বয়সটা কিছু বেশী হইয়া গিয়াছিল, বোধ করি, উনিশের কম হইবে না। তাহার পিতা আধুনিক নবাতন্ত্রের লোক, যত্ন করিয়া মেয়েকে বেশী বয়স পর্যন্ত শিক্ষা দিয়া ম্যাট্রিক পাশ করাইয়াছিলেন। তাঁহার অন্য ইচ্ছা ছিল, শুধু ব্যবসা ফেল পড়িয়া আকস্মিক দারিদ্রের জন্যই এই সুপাত্রে কন্যা অর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

লক্ষ্মী শহরের মেয়ে, স্বামীকে দুই-চারিদিনেই চিনিয়া ফেলিল।

তাহার মুশকিল হইল এই যে, আত্মীয় মিশ্রিত বহুপরিজন পরিবৃত বৃহৎ সংসারের মধ্যে সে মন খুলিয়া কাহারও সহিত মিশিতে পারিল না। ওদিকে শিবচরণের ভালবাসার ত অন্ত রহিল না। শুধু কেবল বৃদ্ধের তরুণী ভার্যা বলিয়াই নয়, সে যেন একেবারে অমূল্য নিধি লাভ করিল। বাটীর আত্মীয়-আত্মীয়ার দল কোথায় কি করিয়া যে তাহার মন যোগাইবে, খুঁজিয়া পাইল না। একটা কথা সে প্রায়ই শুনিতে পাইত,—এইবার মেজবৌয়ের মুখে কালি পড়িল। কি রূপে, কি গুণে, কি বিদ্যা-বুদ্ধিতে এতদিনে তাহার গর্ব খর্ব হইল।

কিন্তু এত করিয়াও সুবিধা হইল না, মাস-দুয়েকের মধ্যে লক্ষ্মী অসুখে পড়িল। এই অসুখের মধ্যেই একদিন মেজবৌয়ের সাক্ষাৎ মিলিল। তিনি বিপিনের স্ত্রী, বড়-বাড়ির নূতন বধূর জ্বর শুনিয়া দেখিতে আসিয়াছিলেন। বয়সে বোধ হয় দুই-তিন বছরের বড়; তিনি যে সুন্দরী, তাহা মনে মনে লক্ষ্মী স্বীকার করিল। কিন্তু এই বয়সেই দারিদ্র্যের ভীষণ কশাঘাতের চিহ্ন তাহার সর্বাঙ্গে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। সঙ্গে বছর-ছয়েকের একটি ছেলে, সে-ও রোগা। লক্ষ্মী শয্যার একধারে সযত্নে বসিতে স্থান দিয়া ক্ষণকাল নিঃশব্দে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিল। হাতে কয়েকগাছি সোনার চুড়ি ছাড়া আর কোন অলঙ্কার নাই, পরনে ঈষৎ মলিন একখানি রাঙা পাড়ের ধুতি, বোধ হয়, তাহার স্বামীর হইবে, পল্লীগ্রামের প্রথামত ছেলেটি দিগম্বর নয়, তাহারও কোমরে একখানি শিউলিফুলে ছোপানো ছোট কাপড় জড়ানো।

লক্ষ্মী তাহার হাতখানি টানিয়া লইয়া আস্তে আস্তে বলিল, ভাগ্যে জ্বর হয়েছিল, তাই ত আপনার দেখা পেলুম। কিন্তু সম্পর্কে আমি বড় জা হই মেজবৌ। শুনেছি, মেজঠাকুরপো এঁর চেয়ে ঢের ছোট।

মেজবৌ হাসিমুখে কহিল, সম্পর্কে ছোট হলে কি তাকে 'আপনি' বলে?

লক্ষ্মী কহিল, প্রথম দিন এই যা বললুম, 'আপনি' বলবার লোক আমি নই। কিন্তু তাই বলে তুমিও যেন আমাকে দিদি বলে ডেকো না,—ও আমি সইতে পারব না। আমার নাম লক্ষ্মী।

মেজবৌ কহিল, নামটি বলে দিতে হয় না দিদি, আপনাকে দেখলেই জানা যায়। আর আমার নাম—কি জানি, কে যে ঠাট্টা করে কমলা রেখেছিলেন—এই বলিয়া সে সকৌতুকে একটুখানি হাসিল মাত্র।

হরিলক্ষ্মীর ইচ্ছা করিল, সে-ও প্রতিবাদ করিয়া বলে, তোমার পানে তাকালেও তোমার নামটি বুঝা যায়, কিন্তু অনুকৃতির মত শুনাইবার ভয়ে বলিতে পারিল না; কহিল, আমাদের নামের মানে এক। কিন্তু মেজবৌ, আমি তোমাকে 'তুমি' বলতে পারলুম, তুমি পারলে না।

মেজবৌ সহাস্যে জবাব দিল, হঠাৎ না-ই পারলুম, দিদি। এক বয়স ছাড়া আপনি সকল বিষয়েই আমার বড়। যাক না দু'দিন—দরকার হলে বদলে নিতে কতক্ষণ?

হরিলক্ষ্মীর মুখে সহসা ইহার প্রত্যুত্তর যোগাইল না, কিন্তু সে মনে মনে বুঝিল, এই মেয়েটি প্রথম দিনের পরিচয়টিকে মাখামাখিতে পরিণত করিতে চাহে না। কিন্তু কিছু একটা বলিবার পূর্বেই মেজবৌ উঠিবার উপক্রম করিয়া কহিল, এখন তা হলে উঠি দিদি, কাল আবার—

লক্ষ্মী বিস্ময়াপন্ন হইয়া বলিল, এখনই যাবে কিরকম, একটু বসো।

মেজবৌ কহিল, আপনি হুকুম করলে ত বসতেই হবে, কিন্তু আজ যাই দিদি, ওঁর আসবার সময় হলো। এই বলিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং ছেলের হাত ধরিয়া যাইবার পূর্বে সহাস্যবদনে কহিল, আসি দিদি। কাল একটু সকাল সকাল আসব, কেমন? এই বলিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

বিপিনের স্ত্রী চলিয়া গেলে হরিলক্ষ্মী সেইদিকে চাহিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল। এখন জ্বর ছিল না, কিন্তু গ্লানি ছিল। তথাপি

কিছুক্ষণের জন্য সমস্ত সে ভুলিয়া গেল। এতদিন গ্রাম ঝেঁটাইয়া কত বৌ-ঝি যে আসিয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই, কিন্তু পাশেব বাড়ির দরিদ্র ঘরের এই বধূর সহিত তাহাদের তুলনাই হয় না। তাহারা যাচিয়া আসিয়াছে, উঠিতে চাহে না। আর বসিতে বলিলে ত কথাই নাই। সে কত প্রগল্‌ভতা, কত বাচালতা, মনোরঞ্জন করিবার কত কি লজ্জাকর প্রয়াস। ভারাক্রান্ত মন তাহার মাঝে মাঝে বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছে কিন্তু ইহাদেরই মধ্য হইতে অকস্মাৎ কে আসিয়া তাহার রোগশয্যায় মুহূর্ত-কয়েকের তরে নিজের পরিচয় দিয়া গেল। তাহার বাপের বাড়ির কথা জিজ্ঞাসা করিবার সময় হয় নাই, কিন্তু প্রশ্ন না করিবার সময় হয় নাই, কিন্তু প্রশ্ন না করিয়াও লক্ষ্মী কি জানি কেমন করিয়া অনুভব করিল—তাহার মত সে কিছুতেই কলিকাতার মেয়ে নয়। পল্লীঅঞ্চলে লেখাপড়া জানে বলিয়া বিপিনের স্ত্রীর একটা খ্যাতি আছে। লক্ষ্মী ভাবিল, খুব সম্ভব বৌটি সুর করিয়া রামায়ণ মহাভারত পড়িতে পারে, কিন্তু তাহার বেশী নহে। যে পিতা বিপিনের মত দীন-দুঃখীর হাতে মেয়ে দিয়াছে, সে কিছু আর মাষ্টার রাখিয়া স্কুলে পড়াইয়া পাস করাইয়া কন্যা সম্প্রদান করে নাই। উজ্জ্বল শ্যাম—ফরসা বলা চলে না। কিন্তু রূপের কথা ছাড়িয়া দিয়াও, শিক্ষা, সংসর্গ, অবস্থা কিছুতেই ত বিপিনের স্ত্রী তাহার কাছে দাঁড়াইতে পারে না। কিন্তু একটা ব্যাপারে লক্ষ্মীর নিজেকে যেন ছোট মনে হইল। তাহার কণ্ঠস্বর। সে যেন গানের মত, আর বলিবার ধরনটি একেবারে মধু দিয়া ভরা। এতটুকু জড়িমা নাই, কথাগুলি যেন সে বাড়ি হইতে কণ্ঠস্থ করিয়া আসিয়াছিল, এমনই সহজ। কিন্তু সবচেয়ে যে বস্তু তাহাকে বেশী বিদ্ধ করিল, সে ওই মেয়েটির দূরত্ব। সে যে দরিদ্র-ঘরের বধূ, তাহা মুখে না বলিয়াও এমন করিয়াই প্রকাশ করিল, যেন ইহাই তাহার স্বাভাবিক, যেন এ ছাড়া আর কিছু তাহাকে কোনমতেই মানাইত না। দরিদ্র, কিন্তু কাঙ্গাল নয়। এক পরিবারের বধূ একজনের পীড়ায় আর একজন তাহার তত্ত্ব লইতে আসিয়াছে, ইহার অতিরিক্ত লেশমাত্রও অন্য

উদ্দেশ্য নাই।

সন্ধ্যার পরে স্বামী দেখিতে আসিলে হরিলক্ষ্মী নানা কথার পরে কহিল, আজ ও-বাড়ির মেজবৌ-ঠাকরুনকে দেখলাম।

শিবচরণ কহিল, হঁ্যা। আমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন, এতকাল পরে আমাকে নিজেই দেখতে এসেছিলেন। কিন্তু মিনিট-পাঁচেকের বেশী বসতে পারলেন না, কাজ আছে বলে উঠে গেলেন।

শিবচরণ কহিল কাজ? আরে, ওদের দাসী আছে, না চাকর আছে? বাসনমাজা থেকে হাঁড়ি ঠেলা পর্যন্ত—কৈ, তোমার মত শুয়ে-বসে গায়ে ফুঁ দিয়ে কাটাক ত দেখি? এক ঘটি জল পর্যন্ত আর তোমাকে গড়িয়ে খেতে হয় না।

নিজের সম্বন্ধে এইরূপ মন্তব্য হরিলক্ষ্মীর অত্যন্ত খারাপ লাগিল, কিন্তু কথাগুলা নাকি তাহাকে বাড়াইবার জন্যই, লাঞ্ছনার জন্য নহে, এই মনে করিয়া সে রাগ করিল না, বলিল, শুনেছি নাকি মেজবৌর বড় গুমোর, বাড়ি ছেড়ে কোথাও যায় না?

শিবচরণ কহিল, যাবে কোত্থেকে? হাতে ক'গাছি চুড়ি ছাড়া আর ছাইও নেই,—লজ্জায় মুখ দেখাতে পারে না।

হরিলক্ষ্মী একটুখানি হাসিয়া বলিল, লজ্জা কিসের? দেশের লোক কি ওঁর গায়ে জড়োয়া গয়ণা দেখবার জন্য ব্যাকুল হয়ে আছে, না দেখতে না পেলে ছি ছি করে?

শিবচরণ কহিল, জড়োয়া গয়না! আমি যা তোমাকে দিয়েছি, কোন শালার বেটা তা চোখে দেখেছে? পরিবারকে আজ পর্যন্ত দু'গাছা চুড়ি ছাড়া আর গড়িয়ে দিতে পারলি নে! বাবা! টাকার জোর বড় জোর! জুতো মারব আর—

হরিলক্ষ্মী ক্ষুণ্ণ ও অতিশয় লজ্জিত হইয়া বলিল, ছি ছি, ও-সব তুমি কি বলছ?

শিবচরণ কহিল, না না, আমার কাছে লুকোছাপা নেই—যা বলব, তা স্পষ্টাস্পষ্টি কথা।

হরিলক্ষ্মী নিরুত্তরে চোখ বুজিয়া শুইল। বলবারই বা আছে কি? ইহারা দুর্বলের বিরুদ্ধে অত্যন্ত রূঢ় কথা কঠোর ও কর্কশ করিয়া উচ্চারণ করাকেই একমাত্র স্পষ্টবাদিতা বলিয়া জানে। শিবচরণ শান্ত হইল না, বলিতে লাগিল, বিয়েতে যে পাঁচ শ' টাকা ধার নিয়ে গেলি, সুদে-আসলে সাত-আট শ' হয়েছে, তা খেয়াল আছে? গরীব একধারে পড়ে আছিস থাক, ইচ্ছে করলে যে কান মলে দূর করে দিতে পারি। দাসীর যোগ্য নয়,—আমার পরিবারের কাছে গুমোর!

হরিলক্ষ্মী পাশ ফিরিয়া শুইল। অসুখের উপরে বিরক্তি ও লজ্জায় তাহার সর্বশরীর যেন ঝিম ঝিম করিতে লাগিল।

পরদিন দুপুরবেলায় ঘরের মধ্যে মৃদুশব্দে হরিলক্ষ্মী চোখ চাহিয়া দেখিল, বিপিনের স্ত্রী বাহির হইয়া যাইতেছে। ডাকিয়া কহিল, মেজবৌ, চলে যাচ্চো যে?

মেজবৌ সলজ্জে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, আমি ভেবেছিলাম, আপনি ঘুমিয়ে পড়েছেন। আজ কেমন আছেন দিদি?

হরিলক্ষ্মী কহিল, আজ ঢের ভাল আছি, কৈ তোমার ছেলেকে আননি?

মেজবৌ বলিল, আজ সে হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়ল দিদি।

হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়ল মানে কি?

অভ্যাস খারাপ হয়ে যাবে বলে আমি দিনের বেলায় বড় তাকে ঘুমোতে দিইনে দিদি।

হরিলক্ষ্মী জিজ্ঞাসা করিল, রোদে রোদে দুরন্তপনা করে বেড়ায় না?

মেজবৌ কহিল, করে বৈ কি। কিন্তু ঘুমোনোর চেয়ে সে বরঞ্চ ভাল।

তুমি নিজে বুঝি কখনো ঘুমোও না?

মেজবৌ হাসিমুখে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না।

হরিলক্ষ্মী ভাবিয়াছিল, মেয়েদের স্বভাবের মত এবার হয়ত সে তাহার অনবকাশের দীর্ঘ তালিকা দিতে বসিবে, কিন্তু সে সেরূপ কিছুই

করিল না। ইহার পরে অন্যান্য কথাবার্তা চলিতে লাগিল। কথায় কথায় হরিলক্ষ্মী তাহার বাপের বাড়ির কথা, ভাই-বোনের কথা, মাস্টার-মশায়ের কথা, স্কুলের কথা, এমনকি তাহার ম্যাট্রিক পাস করার কথাও গল্প করিয়া ফেলিল। অনেকক্ষণ পরে যখন হুঁশ হইল তখন স্পষ্ট দেখিতে পাইল, শ্রোতা হিসাবে মেজবৌ যত ভালই হউক, বক্তা হিসাবে একেবারে অকিঞ্চিৎকর। নিজের কথা সে প্রায় কিছুই বলে নাই। প্রথমটা লক্ষ্মী লজ্জা বোধ করিল, কিন্তু তখনই মনে করিল, আমার কাছে গল্প করিবার মত তাহার আছেই বা কি! কিন্তু কাল যেমন এই বধূটির বিরুদ্ধে মন তাহার অপ্রসন্ন হইয়া উঠিয়াছিল, আজ তেমনি ভারী একটা তৃপ্তি বোধ করিল।

দেয়ালের মূল্যবান ঘড়িতে নানাবিধ বাজনা-বাদ্য করিয়া তিনটা বাজিল। মেজবৌ উঠিয়া দাঁড়াইয়া সবিনয়ে কহিল, দিদি, আজ তা হলে আসি?

লক্ষ্মী সকৌতুকে বলিল, তোমার বুঝি ভাই তিনটে পর্যন্তই ছুটি? ঠাকুরপো না কি কাঁটায় কাঁটায় ঘড়ি মিলিয়ে বাড়ি ঢোকেন?

মেজবৌ কহিল, আজ তিনি বাড়িতে আছেন।

আজ কেন তবে আর একটু ব'সো না?

মেজবৌ বসিল না, কিন্তু যাবার জন্যও পা বাড়াইল না। আস্তে আস্তে বলিল, দিদি, আপনার কত শিক্ষা-দীক্ষা, কত লেখাপড়া, আমি পাড়াগাঁয়ের—

তোমার বাপের বাড়ি বুঝি পাড়াগাঁয়ে?

হাঁ দিদি, সে একেবারে অজ পল্লীগ্রামে। না বুঝে কাল হয়ত কি বলতে কি বলে ফেলেছি, কিন্তু অসম্মান করার জন্যে,—আপনি যে দিব্যি করতে বলবেন, দিদি—

হরিলক্ষ্মী আশ্চর্য হইয়া কহিল, সে কি মেজবৌ, তুমি ত আমাকে এমন কোন কথাই বলনি!

মেজবৌ এ কথার প্রত্যুত্তরে আর একটি কথাও কহিল না। কিন্তু

'আসি' বলিয়া পুনশ্চ বিদায় লইয়া যখন সে ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল, তখন কণ্ঠস্বর যেন তাহার অকস্মাৎ আর একরকম শুনাইল।

রাত্রিতে শিবচরণ যখন কক্ষে প্রবেশ করিল তখন হরিলক্ষ্মী চুপ করিয়া শুইয়া ছিল। মেজবৌয়ের শেষের কথাগুলা আর তাহার স্মরণ ছিল না। দেহ অপেক্ষাকৃত সুস্থ, মনও শান্ত প্রসন্ন ছিল।

শিবচরণ জিজ্ঞাসা করিল, কেমন আছ বড়বৌ?

লক্ষ্মী উঠিয়া বসিয়া কহিল, ভাল আছি।

শিবচরণ কহিল, সকালের ব্যাপার জান ত? বাছাধনকে ডাকিয়ে এনে সকলের সামনে এমনি কড়কে দিয়েছি যে জন্মে ভুলবে না। আমি বেলপুরের শিবচরণ? হাঁ!

হরিলক্ষ্মী ভীত হইয়া কহিল, কাকে গো?

শিবচরণ কহিল, বিপ্‌নেকে। ডেকে বলে দিলাম, তোমার পরিবার আমার পরিবারের কাছে জাঁক করে তাকে অপমান করে যায়, এত বড় আস্পর্ধা! পাজী, নচ্ছার, ছোটলোকের মেয়ে! তার ন্যাড়া মাথায় ঘোল ঢেলে গাধায় চড়িয়ে গাঁয়ের বাইরে বার করে দিতে পারি, জানিস?

হরিলক্ষ্মীর রোগক্লিষ্ট মুখ একেবারে ফ্যাকাশে হইয়া গেল,—বল কি গো?

শিবচরণ নিজের বুকে তাল ঠুকিয়া সদর্পে বলিতে লাগিল, এ গাঁয়ে জজ বল, ম্যাজিস্ট্রেট বল, আর দারোগা পুলিশ বল, সব শর্মা! এই শর্মা! মরণ-কাঠি, জীয়ন-কাঠি এই হাতে। তুমি বল, কাল যদি না বিপ্‌নের বৌ এসে তোমার পা টেপে ত আমি লাটু চৌধুরীর ছেলেই নই! আমি—

বিপিনের বধূকে সর্বসমক্ষে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করিবার বিবরণ ও ব্যাখ্যায় লাটু চৌধুরীর ছেলে অ-কথা কু-কথার আর শেষ রাখিল না। আর তাহারই সম্মুখে স্তব্ধ নির্নিমেষ চক্ষুতে চাহিয়া হরিলক্ষ্মীর মনে হইতে লাগিল, ধরিত্রী, দ্বিধা হও!

॥ দুই ॥

দ্বিতীয় পক্ষের তরুণী ভার্যার দেহ রক্ষার জন্য শিবচরণ কেবলমাত্র নিজের দেহ ভিন্ন আর সমস্ত দিতে পারিত। হরিলক্ষ্মীর সেই দেহ বেলপুরে সারিতে চাহিল না। ডাক্তার পরামর্শ দিলেন হাওয়া বদলাইবার। শিবচরণ সাড়ে-পনর আনার মর্যাদামত ঘটা করিয়া হাওয়া বদলানোর আয়োজন করিল। যাত্রার শুভদিনে গ্রামের লোক ভাঙ্গিয়া পড়িল, আসিল না কেবল বিপিন ও তাহার স্ত্রী। বাহিরে শিবচরণ যাহা না বলিবার, তাহা বলিতে লাগিল এবং ভিতরে বড়পিসী উদ্দাম হইয়া উঠিলেন। বাহিরেও ধুয়া ধরিবার লোকাভাব ঘটিল না, অন্তঃপুরেও তেমনই পিসীমার চীৎকারের আয়তন বাড়াইতে যথেষ্ট স্ত্রীলোক জুটিল। কিছুই বলিল না শুধু হরিলক্ষ্মী। মেজবৌয়ের প্রতি তাহার ক্ষোভ ও অভিমানের মাত্রা কাহারও অপেক্ষাই কম ছিল না, সে মনে মনে বলিতে লাগিল, তাহার বর্বর স্বামী যত অন্যায়ই করিয়া থাক, সে নিজে ত কিছু করে নাই, কিন্তু ঘরের ও বাহিরের যে-সব মেয়েরা আজ চেঁচাইতেছিল, তাহাদের সহিত কোন সূত্রেই কণ্ঠ মিলাইতে তাহার ঘৃণা বোধ হইল। যাইবার পথে পালকির দরজা ফাঁক করিয়া লক্ষ্মী উৎসুক চক্ষুতে বিপিনের জীর্ণ গৃহের জানালার প্রতি চাহিয়া রহিল কিন্তু কাহারও ছায়াটুকুও তাহার চোখে পড়িল না।

কাশীতে বাড়ি ঠিক করা হইয়াছিল, তথাকার জলবাতাসের গুণে নষ্ট-স্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইতে লক্ষ্মীর বিলম্ব হইল না, মাস-চারেক পরে যখন সে ফিরিয়া আসিল, তাহার দেহের কান্তি দেখিয়া মেয়েদের গোপন ঈর্ষার অবধি রহিল না।

হিম-ঋতু আগতপ্রায়, দুপুরবেলায় মেজবৌ চিররুগ্ন স্বামীর জন্য একটা পশমের গলাবন্ধ বুনিতেছিল, অনতিদূরে বসিয়া ছেলে খেলা করিতেছিল, সে-ই দেখিতে পাইয়া কলরব করিয়া উঠিল, মা, জ্যাঠাইমা।

মা হাতের কাজ ফেলিয়া তাড়াতাড়ি একটা নমস্কার করিয়া লইয়া

আসন পাতিয়া দিল ; স্মিতমুখে প্রশ্ন করিল, শরীর নিরাময় হয়েছে দিদি ?

লক্ষ্মী কহিল, হাঁ, হয়েছে। কিন্তু না হতেও পারত, না ফিরতেও পারতাম, অথচ যাবার সময়ে একটিবার খোঁজও নিলে না। সমস্ত পথটা তোমার জানলার পানে চেয়ে চেয়ে গেলাম, একবার ছায়াটুকুও চোখে পড়ল না। রোগা-বোন চলে যাচ্ছে, একটুখানি মায়াও কি হ'ল না মেজবৌ ? এমনি পাষাণ তুমি !

মেজবৌয়ের চোখ ছলছল করিয়া আসিল, কিন্তু সে কোন উত্তরই দিল না।

লক্ষ্মী বলিল, আমার আর যা দোষই থাক মেজবৌ, তোমার মত কঠিন প্রাণ আমার নয়। ভগবান না করুন, কিন্তু অমন সময়ে আমি তোমাকে না দেখে থাকতে পারতাম না।

মেজবৌ এ অভিযোগেরও কোন জবাব দিল না, নিরুত্তরে দাঁড়াইয়া রহিল।

লক্ষ্মী আর কখনও আসে নাই, আজ এই প্রথম এ বাড়িতে প্রবেশ করিয়াছে। ঘরগুলি ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিয়া বেড়াইতে লাগিল। শতবর্ষের জরাজীর্ণ গৃহ, মাত্র তিনখানি কক্ষ। কোনমতে বাসোপযোগী রহিয়াছে। দরিদ্রের আবাস, আসবাবপত্র নাই বলিলেই চলে, ঘরের চুন-বালি খসিয়াছে, সংস্কার করিবার সামর্থ্য নাই, তথাপি অনাবশ্যক অপরিচ্ছন্নতা এতটুকু কোথাও নাই। স্বল্প বিছানা ঝরঝর করিতেছে, দুই-চারিখানি দেবদেবীর ছবি টাঙ্গানো আছে, আর আছে মেজবৌয়ের হাতের নানাবিধ শিল্পকর্ম। অধিকাংশই পশম ও সূতার কাজ, তাহা শিক্ষানবীশের হাতের লাল ঠোঁটওয়ালা সবুজ রঙের টিয়াপাখী অথবা পাঁচরঙা বেড়ালের মূর্তি নয়। মূল্যবান ফ্রেমে আঁটা লালা-নীল-বেগুনি-ধূসর-পাঁশুটে নানা বিচিত্র রঙের সমাবেশে পশমেবোনা 'ওয়েলকম্' 'আসুন বসুন' অথবা বানান-ভুল গীতার শ্লোকার্থও নয়। লক্ষ্মী সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, ওটি কার ছবি মেজবৌ, যেন চেনা চেনা ঠেকচে ?

মেজবৌ সলজ্জে হাসিয়া কহিল, ওটি তিলক মহারাজের ছবি দেখে বোঝবার চেষ্টা করেছিলাম দিদি, কিন্তু কিছুই হয়নি। এই কথা বলিয়া সম্মুখের দেয়ালে টাঙ্গানো ভারতের কৌস্তুভ মহাবীর তিলকের ছবি আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিল।

লক্ষ্মী বহুক্ষণ সেদিকে চাহিয়া থাকিয়া আস্তে আস্তে বলিল, চিনতে পারিনি, সে আমারই দোষ মেজবৌ, তোমার নয়। আমাকে শেখাবে ভাই? এ বিদ্যে শিখতে যদি পারি ত তোমাকে গুরু বলে মানতে আমার আপত্তি নেই।

মেজবৌ হাসিতে লাগিল।

সেদিন ঘণ্টা তিন-চার পরে বিকালে যখন লক্ষ্মী বাড়ি ফিরিয়া গেল, তখন এই কথাই স্থির করিয়া গেল যে, কলা-শিল্প শিখিতে কাল হইতে সে প্রত্যহ আসিবে।

আসিতেও লাগিল, কিন্তু দশ-পনেরো দিনেই স্পষ্ট বুঝিতে পারিল, এ বিদ্যা শুধু কঠিন নয়, অর্জন করিতেও সুদীর্ঘ সময় লাগিবে।

একদিন লক্ষ্মী কহিল, কৈ মেজবৌ, তুমি আমাকে যত্ন করে শেখাও না।

মেজবৌ বলিল, ঢের সময় লাগবে দিদি, তার চেয়ে বরঞ্চ আপনি অন্য সব বোনা শিখুন।

লক্ষ্মী মনে মনে রাগ করিল, কিন্তু তাহা গোপন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তোমার শিখতে কতদিন লেগেছিল মেজবৌ?

মেজবৌ জবাব দিল, আমাকে কেউ ত শেখায় নি দিদি, নিজের চেষ্টাতেই একটু একটু করে—

লক্ষ্মী বলিল, তাইতেই। নইলে পরের কাছে শিখতে গেলে তোমারও সময়ের হিসাব থাকত।

মুখে সে যাহাই বলুক, মনে মনে নিঃসন্দেহে অনুভব করিতেছিল, মেধা ও তীক্ষ্ণ-বুদ্ধিতে এই মেজবৌয়ের কাছে সে দাঁড়াইতেই পারে না। আজ তাহার শিক্ষার কাজ অগ্রসর হইল না এবং যথাসময়ের অনেক

পূর্বেই সূচ-সূতা-প্যাটার্ন গুটাইয়া লইয়া বাড়ি চলিয়া গেল। পরদিন আসিল না এবং এই প্রথম প্রত্যহ আসায় তাহার ব্যাঘাত হইল।

দিন-চারেক পরে আবার একদিন হরিলক্ষ্মী তাহার সূচ-সূতার বাক্স হাতে করিয়া এ বাটিতে আসিয়া উপস্থিত হইল।

মেজবৌ তাহার ছেলেকে রামায়ণ হইতে ছবি দেখাইয়া দেখাইয়া গল্প বলিতেছিল, সসম্ভ্রমে উঠিয়া আসন পাতিয়া দিল। উদ্বিগ্নকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, দু-তিন দিন আসেন নি, আপনার শরীর ভাল ছিল না বুঝি?

লক্ষ্মী গম্ভীর হইয়া কহিল, না, এমনি পাঁচ-ছ'দিন আসতে পারিনি।

মেজবৌ বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিল, পাঁচ-ছদিন আসেন নি? তাই হবে বোধ হয়। কিন্তু আজ তা হলে দু'ঘণ্টা বেশী থেকে কামাইটা পুষিয়ে নেওয়া চাই।

লক্ষ্মী বলিল, হুঁ। কিন্তু অসুখই যদি আমার করে থাকত মেজবৌ তোমার ত একবার খোঁজ করা উচিত ছিল।

মেজবৌ সলজ্জে বলিল, উচিত নিশ্চয়ই ছিল, কিন্তু সংসারের অসংখ্য রকমের কাজ—একলা মানুষ কাকেই বা, পাঠাই বলুন? কিন্তু অপরাধ হয়েছে, তা স্বীকার করচি দিদি।

লক্ষ্মী মনে মনে খুশী হইল। এ কয়দিন সে অত্যন্ত অভিমানবশেই আসতে পারে নাই, অথচ অহর্নিশি যাই যাই করিয়াই তাহার দিন কাটিয়াছে। এই মেজবৌ ছাড়া শুধু গৃহে কেন, সমস্ত গ্রামের মধ্যেও আর কেহ নাই, যাহার সহিত সে মন খুলিয়া মিশিতে পারে।

ছেলে নিজের মনে ছবি দেখিতেছিল। হরিলক্ষ্মী তাহাকে ডাকিয়া কহিল, নিখিল, কাছে এস ত বাবা? সে কাছে আসিলে লক্ষ্মী বাক্স খুলিয়া একগাছি সরু সোনার হার তাহার গলায় পরাইয়া দিয়া বলিল, যাও, খেলা কর গে।

মায়ের মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিল; সে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কি ওটা দিলেন নাকি?

লক্ষ্মী স্মিতমুখে জবাব দিল, দিলাম বৈ কি?

মেজবৌ কহিল, আপনি দিলেই বা ও নেবে কেন ?

লক্ষ্মী অপ্রতিভ হইয়া উঠিল, কহিল, জ্যাঠাইমা কি একটা হার দিতে পারে না ?

মেজবৌ বলিল, তা জানিনে দিদি, কিন্তু এ কথা নিশ্চয় জানি, মা হয়ে আমি নিতে দিতে পারিনে। নিখিল, ওটা খুলে তোমার জ্যাঠাই-মাকে দিয়ে যাও। দিদি, আমরা গরীব, কিন্তু ভিখিরী নই। কোন একটা দামী জিনিস হঠাৎ পাওয়া গেল বলেই দু'হাত পেতে নেব,—তা নিই নে।

লক্ষ্মী স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। আজও তাহার মনে হইতে লাগিল, পৃথিবী, দ্বিধা হও !

যাবার সময়ে সে কহিল, কিন্তু এ কথা তোমার ভাশুরের কানে যাবে মেজবৌ

মেজবৌ বলিল, তাঁর অনেক কথা আমার কানে আসে, আমার একটা কথা তাঁর কানে গেলে কান অপবিত্র হবে না।

লক্ষ্মী কহিল, বেশ, পরীক্ষা করে দেখলেই হবে। একটু থামিয়া বলিল, আমাকে খামকা অপমান করার দরকার ছিল না মেজবৌ ! আমিও শাস্তি দিতে জানি।

মেজবৌ বলিল, এ আপনার রাগের কথা। নইলে আমি যে আপনাকে অপমান করিনি, শুধু আমার স্বামীকেই খামকা অপমান করতে আপনাকে দিইনি—এ বোঝবার শিক্ষা আপনার আছে।

লক্ষ্মী কহিল, তা আছে, নেই শুধু তোমাদের পাড়াগেঁয়ে মেয়ের সঙ্গে কোঁদল করবার শিক্ষা।

মেজবৌ এই কটূক্তির জবাব দিল না, চুপ করিয়া রহিল।

লক্ষ্মী চলিতে উদ্যত হইয়া বলিল, ওই হারটুকুর দাম যাই হোক, ছেলেটাকে স্নেহবশেই দিয়েছিলাম, তোমার স্বামীর দুঃখ দূর হবে ভেবে দিইনি। মেজবৌ, বড়লোক মাত্রেই গরীবকে শুধু অপমান করে বেড়ায়, এইটুকুই কেবল শিখে রেখেচ, ভালবাসতেও যে পারে, এ তুমি

শেখোনি। শেখা দরকার। তখন কিন্তু গিয়ে হাতে-পায়ে প'ড়ো না।

প্রত্যুত্তরে মেজবৌ শুধু একটু মুচকিয়া হাসিয়া বলিল, না দিদি, সে ভয় তোমাকে করতে হবে না।

॥ তিন ॥

বন্যার চাপে মাটির বাঁধ যখন ভাঙ্গিতে শুরু করে, তখন তাহার অকিঞ্চিৎকর আরম্ভ দেখিয়া মনে করাও যায় না যে অবিশ্রান্ত জলপ্রবাহ এত অল্পকাল মধ্যেই ভাঙ্গনটাকে এমন ভয়াবহ, এমন সুবিশাল করিয়া তুলিবে। ঠিক এমন হইল হরিলক্ষ্মীর। স্বামীর কাছে বিপিন ও তাঁহার স্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগের কথাগুলো যখন তাহার সমাপ্ত হইল, তখন তাহার পরিণাম কল্পনা করিয়া সে নিজেই ভয় পাইল। মিথ্যা বলা তাহার স্বভাবও নহে, বলিতেও তাহার শিক্ষা ও মর্যাদায় বাধে, কিন্তু দুর্নিবার জলস্রোতের মত যে-সকল বাক্য আপন ঝোঁকেই তাহার মুখ দিয়া ঠেলিয়া বাহির হইয়া আসিল, তাহার অনেকগুলিই যে সত্য নহে, তাহা নিজেই সে চিনিতে পারিল। অথচ তাহার গতিরোধ করাও যে তাহার সাধ্যের বাহিরে, ইহাও অনুভব করিতে লক্ষ্মীর বাকী রহিল না। শুধু একটা ব্যাপার সে ঠিক এতখানি জানিত না, সে তাহার স্বামীর স্বভাব। তাহা যেমন নিষ্ঠুর, তেমনই প্রতিহিংসা-পরায়ণ এবং তেমন বর্বর। পীড়ন করিবার কোথায় যে সীমা, সে যেন তাহা জানেই না। আজ শিবচরণ আস্ফালন করিল না, সমস্তটাই শুনিয়া শুধু কহিল, আচ্ছা মাস-ছয়েক পরে দেখো। বছর ঘুরবে না, সে ঠিক।

অপমান ও লাঞ্ছনার জ্বালা হরিলক্ষ্মীর অন্তরে জ্বলিতেই ছিল। বিপিনের স্ত্রী ভালরূপ শাস্তি ভোগ করে তাহা সে যথার্থই চাহিতেছিল, কিন্তু শিবচরণ বাহিরে চলিয়া গেলে তাহার মুখের এই সামান্য কয়েকটা কথা বার বার মনের মধ্যে আবৃত্তি করিয়া লক্ষ্মী মনের মধ্যে আর স্বস্তি পাইল না। কোথায় যেন কি একটা ভারী খারাপ হইল এমনই তাহার বোধ হইতে লাগিল।

দিন-কয়েক পরে কি একটা কথার প্রসঙ্গে হরিলক্ষ্মী হাসিমুখে স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিল, ওঁদের সম্বন্ধে কিছু করছ নাকি ?

কাদের সম্বন্ধে ?

বিপিন ঠাকুরপোদের সম্বন্ধে ?

শিবচরণ নিস্পৃহভাবে কহিল, কি-ই বা করব, আর কি-ই বা করতে পারি ? আমি সামান্য ব্যক্তি বৈ ত না !

হরিলক্ষ্মী উদ্বিগ্ন হইয়া কহিল, এ কথার মানে ?

শিবচরণ বলিল, মেজবৌমা বলে থাকেন কিনা, রাজত্বটা ত আর বঠ্‌ঠাকুরের নয়—ইংরাজ গভর্নমেণ্টের।

হরিলক্ষ্মী কহিল, বলেছে নাকি ? কিন্তু আচ্ছা—

কি আচ্ছা ?

স্ত্রী একটুখানি সন্দেহ প্রকাশ করিয়া বলিল, কিন্তু মেজবৌ ত ও-রমক কথা বড় একটা বলে না। ভয়ানক চালাক কিনা ! অনেকে আবার বাড়িয়েও হয়ত তোমার কাছে বলে যায়।

শিবচরণ কহিল, আশ্চর্য নয়। তবে কিনা, কথাটা আমি নিজের কানেই শুনেছি।

হরিলক্ষ্মী বিশ্বাস করতে পারিল না, কিন্তু তখনকার মত স্বামীর মনোরঞ্জনের নিমিত্ত সহসা কোপ প্রকাশ করিয়া বলিয়া উঠিল, বল কি গো, এতবড় অহঙ্কার ! আমাকে না হয় যা খুশি বলেছে, কিন্তু ভাশুর বলে তোমার ত একটা সম্মান থাকা দরকার।

শিবচরণ বলিল, হিঁদুর ঘরে এই ত পাঁচজনে মনে করে। লেখাপড়া-জানা বিদ্বান মেয়েমানুষ কিনা। তবে আমাকে অপমান করে পার আছে, কিন্তু তোমাকে অপমান করে কারও রক্ষে নেই। সদরে একটু জরুরী কাজ আছে, আমি চললাম।—এই বলিয়া শিবচরণ বাহির হইয়া গেল। কথাটা যে-রকম করিয়া হরিলক্ষ্মীর পাড়িবার ইচ্ছা ছিল তাহা হইল না, বরঞ্চ উল্টা হইয়া গেলে ইহাই তাহার পুনঃ পুনঃ মনে হইতে লাগিল।

সদরে গিয়া শিবচরণ বিপিনকে ডাকাইয়া আনিয়া কহিল, পাঁচ-সাত বছর থেকে তোমাকে বলে আসচি বিপিন, গোয়ালটা তোমার সরাও, শোবার ঘরে আমি আর টিঁকতে পারিনে, কথাটায় কি তুমি কান দেবে না ঠিক করেছ ?

বিপিন বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিল, কৈ, আমি ত একবারও শুনিনি বড়দা ?

শিবচরণ অবলীলাক্রমে কহিল, অন্ততঃ দশবার আমি নিজের মুখেই তোমাকে বলেছি। তোমার স্মরণ না থাকলে ক্ষতি হয় না, এতবড় জমিদারি যাকে শাসন করতে হয়, তার কথা ভুলে গেলে চলে না। সে যাই হোক, তোমার আপনার ত একটা আক্কেল থাকা উচিত যে, পরের জায়গায় নিজের গোয়ালঘর রাখা কতদিন চলে ? কালকেই ওটা সরিয়ে ফেল গে। আমার আর সুবিধে হবে না, তোমাকে শেষবারের মত জানিয়ে দিলাম।

বিপিনের মুখে এমনই কথা বাহির হয় না, অকস্মাৎ এই পরম বিস্ময়কর প্রস্তাবের সম্মুখে সে একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িল। তাহার পিতামহর আমল হইতে যে গোয়ালঘরটাকে সে নিজেদের বলিয়া জানে, তাহা অপরের এতবড় মিথ্যা উক্তির সে একটা প্রতিবাদ পর্যন্ত করিতে পারিল না, নীরবে বাড়ি ফিরিয়া আসিল।

তাহার স্ত্রী সমস্ত বিবরণ শুনিয়া কহিল, কিন্তু রাজার আদালত খোলা আছে ত !

বিপিন চুপ করিয়া রহিল। সে যত ভালমানুষই হউক, এ কথা সে জানিত ইংরাজ রাজার আদালতগৃহের সুবৃহৎ দ্বার যত উন্মুক্তই থাক, দারিদ্রের প্রবেশ করিবার পথ এতটুকু খোলা নাই। হইলও তাহাই। পরদিন বড়বাবুর লোক আসিয়া প্রাচীন ও জীর্ণ গোশালা ভাঙ্গিয়া লম্বা প্রাচীর টানিয়া দিল। বিপিন থানায় গিয়া খবর দিয়া আসিল, কিন্তু আশ্চর্য এই যে, শিবচরণের পুরাতন ইঁটের নূতন প্রাচীর যতক্ষণ না সম্পূর্ণ হইল, ততক্ষণ পর্যন্ত একটা রাঙ্গা পাগড়িও ইহার নিকটে আসিল

না। বিপিনের স্ত্রী হাতের চুড়ি বেচিয়া আদালতে নালিশ করিল, কিন্তু তাহাতে শুধু গহনাটাই গেল, আর কিছু হইল না।

বিপিনের পিসীমা-সম্পর্কীয় একজন শুভানুধ্যায়িনী এই বিপদে হরিলক্ষ্মীর কাছে গিয়া পড়িতে বিপিনের স্ত্রীকে পরামর্শ দিয়াছিলেন: তাহাতে সে নাকি জবাব দিয়েছিল, বাঘের কাছে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে আর লাভ কি পিসীমা? প্রাণ যা যাবার তা যাবে, কেবল অপমানটাই উপরি পাওনা হবে।

এই কথা হরিলক্ষ্মীর কানে আসিয়া পৌঁছিলে সে চুপ করিয়া রহিল, কিন্তু একটা উত্তর দেবার চেষ্টা পর্যন্ত করিল না।

পশ্চিম হইতে ফিরিয়া অবধি শরীর তাহার কোনদিনই সম্পূর্ণ সুস্থ ছিল না, এই ঘটনার মাস-খানেকের মধ্যে সে আবার জ্বরে পড়িল। কিছুকাল গ্রামেই চিকিৎসা চলিল কিন্তু ফল যখন হইল না, তখন ডাক্তারের উপদেশমত পুনরায় তাহাকে বিদেশযাত্রার জন্য প্রস্তুত হইতে হইল।

নানাবিধ কাজের তাড়ায় এবার শিবচরণ সঙ্গে যাইতে পারিল না, দেশেই রহিল। যাবার সময় সে স্বামীকে একটা কথা বলিবার জন্য মনে মনে ছটফট করিতে লাগিল, কিন্তু মুখ ফুটিয়া কোনমতেই সে এই লোকটির সম্মুখে সে কথা উচ্চারণ করিতে পারিল না। তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, এ অনুরোধ বৃথা, ইহার অর্থ সে বুঝিবে না।

।। চার ।।

হরিলক্ষ্মীর রোগাগ্রস্ত দেহ সম্পূর্ণ নিরাময় হইতে এবার কিছু দীর্ঘ সময় লাগিল। প্রায় বৎসরাধিক কাল পরে সে বেলপুরে ফিরিয়া আসিল। শুধু কেবল জমিদারের আদরের পত্নী বলিয়াই নয়, সে এতবড় সংসারের গৃহিণী। পাড়ার মেয়েরা দল বাঁধিয়া দেখিতে আসিল, যে সম্বন্ধে বড়, সে আশীর্বাদ করিল, যে ছোট সে প্রণাম করিয়া পায়ের

ধূলা লইল। আসিল না শুধু বিপিনের স্ত্রী। সে যে আসিবে না, হরিলক্ষ্মী তাহা জানিত। এই একটা বছরের মধ্যে তাহারা কেমন আছে, যে-সকল ফৌজদারী ও দেওয়ানী মামলা তাহাদের বিরুদ্ধে চলিতেছিল, তাহার ফল কি হইয়াছে, এ-সব কোন সংবাদই সে কাহারও কাছে জানিবার চেষ্টা করে নাই। শিবচরণ কখনও বাটীতে, কখনও বা পশ্চিমে স্ত্রীর কাছে গিয়া বাস করিতেছিলেন। যখনই দেখা হইয়াছে, সর্বাগ্রে ইহাদের কথাই তাহার মনে হইয়াছে। অথচ একটা দিনের জন্য স্বামীকে প্রশ্ন করে নাই। প্রশ্ন করিতে তাহার যেন ভয় করিত। মনে করিত, এতদিনে হয়ত যা হউক একটা বোঝাপড়া হইয়া গিয়াছে, হয়ত ক্রোধের সে প্রখরতা আর নাই—জিজ্ঞাসাবাদের দ্বারা পাছে আবার সেই পূর্বক্ষত বাড়িয়া উঠে, এ আশঙ্কায় সে এমনই একটা ভাব ধারণ করিয়া থাকিত, যেন সে সকল তুচ্ছ কথা আর তাহার মনেই নাই। ওদিকে শিবচরণও নিজে হইতে কোনদিন বিপিনদের বিষয় আলোচনা করিত না। সে যে স্ত্রীর অপমানের ব্যাপার বিস্মৃত হয় নাই, বরঞ্চ তাহার অবর্তমানে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছে, এই কথাটা সে হরিলক্ষ্মীর কাছে গোপন করিয়াই রাখিত। তাহার সাধ ছিল, লক্ষ্মী গৃহে ফিরিয়া নিজের চোখেই সমস্ত দেখিতে পাইয়া আনন্দিত বিস্ময়ে আত্মহারা হইয়া উঠিবে।

বেলা বাড়িয়া উঠিবার পূর্বেই পিসীমার পুনঃ পুনঃ সস্নেহ তাড়নায় লক্ষ্মী স্নান করিয়া আসিলে তিনি উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিয়া বলিলেন, তোমার রোগা শরীর বৌমা, নীচে গিয়ে কাজ নেই, এইখানেই ঠাঁই করে ভাত দিয়ে যাক।

লক্ষ্মী আপত্তি করিয়া সহাস্যে কহিল, শরীর আগের মতই ভাল হয়ে গেছে পিসীমা, আমি রান্নাঘরে গিয়েই খেতে পারব, ওপরে বয়ে আনবার দরকার নেই। চল, নীচেই যাচ্চি।

পিসীমা বাধা দিলেন, শিবুর নিষেধ আছে জানাইলেন এবং তাহারই আদেশে ঝি ঘরের মেঝেতে আসন পাতিয়া ঠাঁই করিয়া দিয়া গেল।

পরক্ষণে রাঁধুনী অন্নব্যঞ্জন বাহিয়া আনিয়া উপস্থিত করিল। সে চলিয়া গেলে লক্ষ্মী আসনে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, রাঁধুনীটি কে, পিসীমা? আগে ত দেখিনি?

পিসীমা হাস্য করিয়া বলিলেন, চিনতে পারলে না বৌমা, ও যে আমাদের বিপিনের বৌ।

লক্ষ্মী স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। মনে মনে বুঝিল, তাহাকে চমৎকৃত করিবার জন্যই এতখানি ষড়যন্ত্র এমন করিয়া গোপনে রাখা হইয়াছিল। কিছুক্ষণে আপনাকে সামলাইয়া লইয়া জিজ্ঞাসু-মুখে পিসীমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

পিসীমা বলিলেন, বিপিন মারা গেছে, শুনেছ ত?

লক্ষ্মী শুনে নাই কিছুই কিন্তু এইমাত্র যে তাহার খাবার দিয়া গেল, সে যে বিধবা, তাহা চাহিলেই বুঝা যায়। ঘাড় নাড়িয়া কহিল, হাঁ।

পিসীমা অবশিষ্ট ঘটনাটা বিবৃত করিয়া কহিলেন, যা ধুলোগুঁড়ো ছিল, মামলায় মামলায় সর্বস্ব খুইয়ে বিপিন মারা গেল। বাকী টাকার দায়ে বাড়িটাও যেত। আমরাই পরামর্শ দিলাম, মেজবৌ, বছর দু'বছর গতরে খেটে শোধ দে, তোর অপোগণ্ড ছেলের মাথা গোঁজবার স্থানটুকু বাঁচুক।

লক্ষ্মী বিবর্ণ-মুখে তেমনই পলকহীন চক্ষুতে নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল। পিসীমা সহসা গলা খাটো করিয়া বলিলেন, তবু আমি একদিন ওকে আড়ালে ডেকে বলেছিলাম, মেজবৌ, যা হবার তা ত হলো, এখন ধার-ধোর করে যেমন করে হোক, একবার কাশী গিয়ে বৌমার হাতে-পায়ে গিয়ে পড়। ছেলেটাকে তার গায়ের উপর নিয়ে ফেলে দিয়ে বল গে, দিদি, এর তো কোন দোষ নেই, একে বাঁচাও—

কথাগুলি আবৃত্তি করিতেই পিসীমার চোখ জল-ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল, অঞ্চলে মুছিয়া ফেলিয়া বলিলেন, কিন্তু সেই যে মাথা গুঁজে মুখ বুজে বসে রইল, হাঁ-না একটা জবাব পর্যন্ত দিলে না।

হরিলক্ষ্মী বুঝিল, ইহার সমস্ত অপরাধের ভারই তাহার মাথায় গিয়া

গিয়া পড়িয়াছে। তাহার মুখে সমস্ত অন্নব্যঞ্জন তিতো বিষ হইয়া উঠিল এবং একটা গ্রাসও যেন গলা দিয়া গলিতে চাহিল না। পিসীমা কি একটা কাজে ক্ষণকালের জন্য বাহিরে গিয়াছিলেন, তিনি ফিরিয়া আসিয়া খাবারের অবস্থা দেখিয়া চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। ডাক দিলেন, বিপিনের বৌ! বিপিনের বৌ!

বিপিনের বৌ দ্বারের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইতেই তিনি ঝঙ্কার দিয়া উঠিলেন। তাঁহার মুহূর্ত পূর্বের করুণা চক্ষুর নিমিষে কোথায় উবিয়া গেল। তীক্ষ্ণস্বরে বলিয়া উঠিলেন, এমন তাচ্ছিল্য করে কাজ করলে ত চলবে না, বিপিনের বৌ! বৌমা একটা দানা মুখে দিতে পারলে না, এমনই রেঁধেছ!

ঘরের বাহির হইতে এই তিরস্কারের কোন উত্তর আসিল না, কিন্তু অপরের অপমানের ভারে লজ্জায় ও বেদনায় ঘরের মধ্যে হরিলক্ষ্মীর মাথা হেঁট হইয়া গেল।

পিসীমা পুনশ্চ কহিলেন, চাকরি করতে এসে জিনিসপত্র নষ্ট করে ফেললে চলবে না, বাছা, আরও পাঁচজনে যেমন করে কাজ করে, তোমাকেও তেমনই করতে হবে, তা বলে দিচ্চি।

বিপিনের স্ত্রী এবার আস্তে আস্তে বলিল. প্রাণপণে সেই চেষ্টাই ত করি পিসীমা, আজ হয়ত কি-রকম হয়ে গেছে। এই বলিয়া সে নীচে চলিয়া গেলে, লক্ষ্মী উঠিয়া দাঁড়াইবামাত্র পিসীমা হায় হায় করিয়া উঠিলেন।

লক্ষ্মী মৃদুকণ্ঠে কহিল, কেন দুঃখ করচ পিসীমা, আমার দেহ ভাল নেই বলেই খেতে পারলাম না,—মেজবৌয়ের রান্নার ত্রুটি ছিল না।

হাত-মুখ ধুইয়া আসিয়া নিজের নির্জন ঘরের মধ্যে হরিলক্ষ্মীর যেন দম বন্ধ হইয়া আসিতে লাগিল। সর্বপ্রকার অপমান সহিয়াও বিপিনের স্ত্রীর হয়ত ইহার পরেও এই বাড়িতেই চাকরি করা চলিতে পারে, কিন্তু আজকের পরে গৃহিণীপনার পণ্ডশ্রম করিয়া তাহার নিজের দিন চলিবে কি করিয়া? মেজবৌয়ের একটা সান্ত্বনা তবুও বাকী আছে,—তাহা

বিনাদোষে দুঃখ সহার সান্ত্বনা, কিন্তু তাহার নিজের জন্য কোথায় কি অবশিষ্ট রহিল!

রাত্রিতে স্বামীর সহিত কথা কহিবে কি, হরিলক্ষ্মী ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিতেও পারিল না। আজ তাহার মুখের একটা কথায় বিপিনের স্ত্রীর সকল দুঃখ দূর হইতে পারিত, কিন্তু নিরুপায় নারীর প্রতি যে মানুষ এতবড় শোধ লইতে পারে, তাহার পৌরুষে বাধে না, তাহার কাছে ভিক্ষা চাহিবার হীনতা স্বীকার করিতে কোনমতেই লক্ষ্মীর প্রবৃত্তি হইল না।

শিবচরণ ঈষৎ হাসিয়া প্রশ্ন করিল, মেজবৌমার সঙ্গে হলো দেখা? বলি কেমন রাঁধচে?

হরিলক্ষ্মী জবাব দিতে পারিল না, তাহার মনে হইল, এই লোকটিই তাহার স্বামী এবং সারাজীবন ইহারই ঘর করিতে হইবে মনে করিয়া তাহার মনে হইল, পৃথিবী, দ্বিধা হও!

পরদিন সকালে উঠিয়াই লক্ষ্মী দাসীকে দিয়া পিসীমাকে বলিয়া পাঠাইল, তাহার জ্বর হইয়াছে, সে কিছুই খাইবে না।

পিসীমা ঘরে আসিয়া জেরা করিয়া লক্ষ্মীকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিলেন,—তাহার মুখের ভাবে ও কণ্ঠস্বরে তাঁহার কেমন যেন সন্দেহ হইল, লক্ষ্মী কি একটা গোপন করিবার চেষ্টা করিতেছে। কহিলেন, কিন্তু তোমার ত সত্যিই অসুখ করেনি বৌমা?

লক্ষ্মী মাথা নাড়িয়া জোর করিয়া বলিল, আমার জ্বর হয়েছে, আমি কিচ্ছু খাব না।

ডাক্তার আসিলে তাঁহাকে দ্বারের বাহির হইতেই লক্ষ্মী বিদায় করিয়া দিয়া বলিল, আপনি ত জানেন, আপনার ওষুধে আমার কিছুই হয় না,—আপনি যান।

শিবচরণ আসিয়া অনেক-কিছু প্রশ্ন করিল, কিন্তু একটা কথারও উত্তর পাইল না।

আরও দুই-তিনদিন যখন এমনই করিয়া কাটিয়া গেল, তখন বাড়ির

সকলেই কেমন যেন অজানা আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল।

সেদিন বেলা প্রায় তৃতীয় প্রহর, লক্ষ্মী স্নানের ঘর হইতে নিঃশব্দ মৃদুপদে প্রাঙ্গণের একধার দিয়া উপরে যাইতেছিল, পিসীমা রান্নাঘরের বারান্দা হইতে দেখিতে পাইয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন, দেখ বৌমা, বিপিনের বৌয়ের কাজ!—আঁ মেজবৌ, শেষকালে চুরি শুরু করলে?

হরিলক্ষ্মী কাছে গিয়া দাঁড়াইল। মেজবৌ মেঝের উপর নির্বাক অধোমুখে বসিয়া একটা পাত্রে অন্ধব্যঞ্জন গামছা ঢাকা দেওয়া সম্মুখে রাখা; পিসীমা দেখাইয়া বলিলেন, তুমিই বল বৌমা, এত ভাত-তরকারি একটা মানুষে খেতে পারে? ঘরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ছেলের জন্যে; অথচ বার বার করে মানা করে দেওয়া হয়েছে। শিবচরণের কানে গেলে আর রক্ষে থাকবে না—ঘাড় ধরে দূর করে তাড়িয়ে দেবে। বৌমা, তুমি মনিব, তুমিই এর বিচার কর। এই বলিয়া পিসীমা যেন একটা কর্তব্য শেষ করিয়া হাঁফ ফেলিয়া বাঁচিলেন।

তাঁহার চীৎকার-শব্দে বাড়ির চাকর দাসী, লোকজন যে যেখানে ছিল, তামাশা দেখিতে ছুটিয়া আসিয়া দাঁড়াইল, আর তাহারই মধ্যে নিঃশব্দে বসিয়া ও-বাড়ির মেজবৌ ও তাহার কর্ত্রী এ-বাড়ির গৃহিণী।

এত ছোট, এত তুচ্ছ বস্তু লইয়া এতবড় কদর্য কাণ্ড বাধিতে পারে, লক্ষ্মীর তাহা স্বপ্নের অগোচর। অভিযোগের জবাব দিবে কি, অপমানে, অভিমানে লজ্জায় সে মুখ তুলিতেই পারিল না। লজ্জা অপরের জন্য নয়, সে নিজের জন্যই। চোখ দিয়া তাহার জল পড়িতে লাগিল, তাহার মনে হইল, এত লোকের সম্মুখে সে-ই যেন ধরা পড়িয়া গেছে এবং বিপিনের স্ত্রী-ই তাহার বিচার করিতে বসিয়াছে।

মিনিট দুই-তিন এমনইভাবে থাকিয়া সহসা প্রবল চেষ্টায় লক্ষ্মী আপনাকে সামলাইয়া লইয়া কহিল, পিসীমা, তোমরা সবাই একবার এ-ঘর থেকে যাও।

তাহার ইঙ্গিতে সকলে প্রস্থান করিলে লক্ষ্মী ধীরে ধীরে মেজবৌয়ের কাছে গিয়া বসিল: হাত দিয়া তাহার মুখ তুলিয়া ধরিয়া দেখিল, তাহারও দুইচোখ বাহিয়া জল পড়িতেছে। কহিল, মেজবৌ, আমি তোমার দিদি, এই বলিয়া নিজের অঞ্চল দিয়া তাহার অশ্রু মুছাইয়া দিল।

কোরেল

লণ্ডন নগরের পঞ্চাশৎ মাইল উত্তরে কোরেল নামে একটি গ্রামে ক্ষুদ্র স্রোতস্বতীতীরস্থ দুইখানি অট্টালিকা গ্রামের শোভা শতগুণে বর্ধিত করিয়া রাখিয়াছিল। উভয়ের সৌন্দর্যে একটা সাদৃশ্য থাকিলেও একটি অপরটি অপেক্ষা এত বৃহৎ জমকাল এবং মূল্যবান যে, দেখিলে বোধহয় যেন কোন রাজা তাঁহার যৌবনের প্রথমাবস্থায় এটি নির্মাণ করাইয়াছিলেন। তাহার পর যত দিন গড়াইয়া পড়িতে লাগিল, সুখসম্পদ পরিব্যাপ্ত আত্মসুখ যেদিন মরণের ছায়াটা সম্মুখে ঈষৎ হেলাইয়া ধরিয়াছিল, সেইদিন হইতে বোধহয় অপরটির নির্মাণকর্ম আরম্ভ করাইয়াছিলেন। তাহাই যৌবনে এবং বার্ধক্যে যেরূপ প্রভেদ, এই দুইটি অট্টালিকার মধ্যেও সেইরূপ একটা প্রভেদ লক্ষিত হইত। একটি তাঁহার বিলাসভবন, রাজসভা, অপরটা তাঁহার শান্তিনিকেতন, কুঞ্জকানন। একটিতে কত মর্মরপ্রস্তর, কারুকার্যশোভিত কত ঝরণা, রঞ্জিত পত্রপুষ্পগঠিত কুঞ্জবন,—তাহার পর তোশাখানা, অশ্বশালা, পশ্বালয় গ্রামের মত চতুর্দিকে ঘেরিয়া আছে, আর ভিতরে কত আসবাব! কত টেবিল, চেয়ার, পিয়ানো প্রভৃতি বহুমূল্য কার্পেটের উপর দাঁড়াইয়া আছে—ভিত্তিসংলগ্ন বৃহৎ মুকুরে সে শোভা সহস্রবার প্রতিফলিত হইয়াছে,—তাহার উপর কত রকমের চিত্র, নানাবিধ ঝাড়লণ্ঠন দেয়ালগিরির মধ্য দিয়া স্ব স্ব সৌন্দর্য শতগুণে বৃদ্ধি করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু অপরটিতে অত কিছু নাই। বাইরে শুধু শ্যামল তৃণদল, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুষ্পতরু, লতাবিতান, একঝাড় পিয়ার বৃক্ষ, একদল আঙ্গুরের কুঞ্জবন মধ্যে দুই একটি বসিবার বেঞ্চ; নদীর ধারে দুই ঝাড় বংশবাটিকা, তন্মধ্যে এই ক্ষুদ্র অট্টালিকাখানি নদীতীর হইতে ঈষৎ দেখা যায় মাত্র!

দুইজন প্রাচীন সৈনিক এই দুই ভবনের অধিকারী। এক জনের নাম ক্যাপ্টান নোল; অপরের নাম কর্ণেল হ্যারিংটন। যুদ্ধকর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া দুই বন্ধু নির্জনে এই দুটি অট্টালিকা সামর্থ্য অনুসারে ক্রয় করিয়া বাস করিতেছিলেন। Captain Nol'-এর একটি মাত্র কন্যা—নাম মেরি; Colonel Harrington-এরও একটি মাত্র পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, তাহার নাম লিওপোল্ড—জননী আদর করিয়া লিও বলিয়া ডাকিতেন।

একদিন লিওর জননী পুত্রকে শিয়রে বসাইয়া মেরিকে আশীর্বাদ করিয়া স্বামীর কর নিজ করে গ্রহণ করিয়া বসন্তপ্রভাতে সূর্যোদয়ের সহিত হাসিমুখে চিরদিনের মত প্রস্থান করিলেন। লিওর তখন দশ বর্ষ মাত্র বয়ঃক্রম;—খুব কাঁদিতে লাগিল। মেরির জননী আসিয়া তাহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন, মুখ চুম্বন করিয়া বলিলেন, 'ভয় কি বাবা, আমি চিরদিন তোমার মা হইয়া থাকিব।' সপ্তবর্ষীয়া বালিকা মেরি লিওর হাত ধরিয়া বলিল, 'লিও কাঁদিও না—চুপ কর।' লিও চুপ করিল।

স্ত্রীবিয়োগের পর কর্ণেল হ্যারিংটন জুয়াক্রীড়ায় নিতান্ত মনঃসংযোগ করিলেন। সঞ্চিত অর্থ যত সঙ্কুচিত হইয়া আসিতে লাগিল, প্রবাসী পুত্রমুখ স্মরণ করিয়া তত অধিক উৎসাহের সহিত নষ্ট ধন পুনঃপ্রাপ্তির আশায় জুয়াক্রীড়া করিতে লাগিলেন। ক্রমে সমস্ত নিঃশেষ হইয়া আসিল, ক্রীড়ার মত্ততায় তিনি আত্মবিস্মৃত হইয়া বন্ধু নোলের নিকট বাটী বন্ধক রাখিয়া ঋণ গ্রহণ করিলেন। তাহাও শেষ হইল দারুণ নিরাশায় তাঁহার উন্মত্ততা আসিল, একদিন রাত্রে খাইবার সংস্থান পর্যন্ত নাই—আর সহ্য হইল না—বন্দুকে গুলি ভরিয়া আত্মহত্যা করিলেন। পুত্র লিও তখন লণ্ডনে বিদ্যাভ্যাস করিতেছিল - সংবাদ পাইয়া বাটী আসিল। মেরির জননী তখন জীবিত নাই। ক্যাপ্টান নোল মৌখিক সান্ত্বনা মাত্র করিলেন। সপ্তদশ বর্ষীয় লিও অকূলসমুদ্র দেখিয়া যখন ছটফট করিতেছিল, নিরতিশয় মমতায় করুণ অশ্রুভারাক্রান্ত চক্ষু দুটি

লিওর মুখের পানে রাখিয়া তাহার হাত ধরিয়া মেরি কহিল, 'লিও ভয় করিও না—তোমার মেরি এখনও মরে নাই।'

এ কথার অর্থ সবাই বুঝে,—লিও অন্তরে আশীর্বাদ করিয়া মৃদু কম্পিত-কণ্ঠে বলিল, 'তাই হউক—জগদীশ্বর তোমাকে সুখে রাখিবেন।'

কিন্তু সেবার দুইজনেরই বড় দুর্বৎসর পড়িয়াছিল,—অধিক দিন না যাইতেই ক্যাপ্টান নোল জ্বরবিকারে প্রাণত্যাগ করিলেন। পিতৃ-মাতৃহীন মেরি লিওর বুকে মুখ রাখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, 'লিও শুধু তুমি রহিলে—বিপদে-সম্পদে আমাকে রক্ষা করিও।'

লিও চক্ষু-দুটি মুছাইয়া দিয়া বলিল, 'করিব'।

'প্রতিজ্ঞা কর কখন পরিত্যাগ করিবে না।'

'প্রতিজ্ঞা করিলাম।

মেরি মুখ তুলিয়া ধীরে ধীরে বলিল, 'তবে আর কাঁদিব না;—আমার সব আছে।'

দুই

লিও একখানি পুস্তক লিখিয়াছিল। লণ্ডন নগরে তাহার একজন বন্ধু ছিলেন। সমালোচনার জন্য হস্তলিখিত পুস্তকখানি তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দেয়। কিছুদিন পরে এইরূপ উত্তর আসিল, 'বন্ধু, তোমার গৌরবে আমি গৌরবান্বিত হইয়াছি। তোমার লিখিত পুস্তকখানি একজন পুস্তক-প্রকাশকের নিকট কতকটা বাধ্য হইয়া বিক্রয় করিয়াছি। পাঁচ শত পাউণ্ড পাঠাইলাম—রাগ করিও না. ভবিষ্যৎ উন্নতির বোধহয় ইহাই সোপান।'

এ কথা শুনিয়া মেরির চক্ষে জল আসিল,—আনন্দে সে লিওর মুখচুম্বন করিয়া বলিল, 'লিও জগতে তুমি সর্বপ্রধান কবি হইবে।'

লিও হাসিয়া উঠিল, 'আর কিছু না হউক মেরি, পিতার ঋণ বোধহয় পরিশোধ করিতে পারিব।'

মেরি আজকাল স্বয়ং উত্তমর্ণ, তাই এ কথায় বড় লজ্জা পাইত। রাগ করিয়া বলিল, 'এ কথা পুনর্বার বলিলে তোমার কাছে আমি আর আসিব না।'

লিও হাসিল, মনে মনে কহিল, 'তোমার পিতার নিকট আমার পিতা ঋণী ; আমার দুজনে তাঁহাদের সন্তান, তাই আমি জীবিত থাকিলে এ ঋণ তোমার নিকট পরিশোধ করিবই।'

লিওর আজকাল বড় পরিশ্রম বাড়িয়াছে। নূতন পুস্তক লিখিতেছিল, আজ সমস্ত দিন মুখ তুলিয়া চাহে নাই। মেরি প্রত্যহ যেমন আসিত, আজিও তেমনি আসিয়াছিল। লিওর শয়নকক্ষ, পাঠাগার, বসিবার ঘর প্রভৃতি স্বহস্তে সাজাইয়া গুছাইয়া দিতেছিল। দাসদাসী সত্ত্বেও এ কাজটি মেরি নিজে করিয়া যাইত।

সম্মুখে একখানা দর্পণ ছিল, লিওর প্রতিবিম্ব তাহার উপর প্রতিফলিত হইয়াছিল। মেরি বহুক্ষণ ধরিয়া তাহা দেখিয়া বলিল, 'লিও তুমি স্ত্রীলোক হইলে এতদিন ইংলণ্ডের রানী হইতে।

লিও হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কেন' ?

'অত রূপ দেখিয়া রাজা তোমাকে বিবাহ করিয়া সিংহাসনে লইয়া যাইতেন। তোমার মত কৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশরাশি আমি আর্ট গ্যালারিতে কোন রাণীর দেখি নাই : এমন শুভ্র কোমল মুখশ্রী কোন্ সম্রাজ্ঞীর ছিল ? গোলাপ পুষ্পের মত এমন কোমল মধুময় দেহশোভা স্বর্গে ভিনসেরও ছিল বলিয়া মনে হয় না।'

লিও খুব হাসিয়া উঠিল। কলেজে অধ্যয়নকালেও এমন কথা অনেকে কহিয়াছিল : বোধহয় তাহাই মনে পড়িয়াছিল। হাসিয়া কহিল, 'রূপ যদি চুরি করা যাইত তা হইলে তুমি বোধহয় এ রূপ চুরি করিয়া আমাকে ফাঁকি দিয়া এতদিনে ইংলণ্ডের রানী হইয়া যাইত।'

মেরি মনে মনে অপ্রতিভ হইয়া সলজ্জ হাসিয়া বলিল, 'তুমি স্ত্রীলোকের মত দুর্বল, তাহাদের মত কোমল তাহাদের মতই সুন্দর—তোমার রূপের সীমা নাই।'

এত রূপের নিকট মেরি আপনাকে বড় ক্ষুদ্র বিবেচনা করিত।

তিন

কোরেল গ্রামে প্রতি বৎসর অতি সমারোহের সহিত ঘোড়দৌড় হইত। আজি সেই উপলক্ষে প্রান্তস্থিত মাঠে বহু জনসমাগম হইয়াছিল।

মেরি ধীরে ধীরে লিওর পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইল। লিও তখনও অত্যন্ত মনোযোগের সহিত পুস্তক লিখিতেছিল, তাই দেখিতে পাইল না। মেরি কহিল, 'আমি আসিয়াছি, ফিরিয়া দেখ।'

লিও ফিরিয়া দেখিয়া কহিল, 'ইস—এত সাজিয়াছ কেন?'

মেরিও হাসিয়া ফেলিল; কহিল, 'সাজিয়াছি কেন শুনিবে?'

'বল!'

'আজ ঘোড়দৌড় হইবে। যে জয়ী হইবে, সে আজ আমাকেই ফুলের মালা দিবে।'

'তবে ত তোমার আজ বড় সম্মান! তাই এত সাজসজ্জা!'

মেরি প্রীতি-প্রফুল্ল নেত্রে কিছুক্ষণ লিওর মুখপানে চাহিয়া রহিল; তাহার পর পরম স্নেহে দুই হস্তে তাহার গ্রীবা বেষ্টন করিয়া মুখের কাছে মুখ রাখিয়া বলিল, 'শুধু তাই নয়, তুমি আমার কাছে থাকিবে। তোমার পাশে দাঁড়াইয়া পাছে নিতান্ত কুৎসিত দেখিতে হই, সেই ভয়ে এত সাজিয়াছি; মণিমুক্তায় রূপ বাড়ে ত?'

সম্মুখস্থিত মুকুরে দুটি মুখ এতক্ষণ দুটি পরিস্ফুট গোলাপ ফুলের মত ফুটিয়া উঠিয়াছিল, লিও তাহা দেখাইয়া বলিল—'ঐ দেখ।'

মেরি অতৃপ্ত নয়নে কিছুক্ষণ ঐ দুটি ছবির পানে চাহিয়া রহিল। তাহার বোধ হইল সেও বড় সুন্দরী আজ তাহার প্রথম মনে হইল সৌন্দর্যের আশ্রয়ে দাঁড়াইলে কুৎসিত দেখিতে হয় না, বরং যাহা সৎ তাহাকে জড়াইয়া থাকিলে দোষটুকুও চাপা পড়িয়া যায়। আবেশে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া মেরি ধীরে ধীরে কহিল, 'আমি যেন চাঁদের কলঙ্ক—তবু আমার কত শোভা!'

মেরি শিহরিয়া উঠিল। লিও তাহা অনুভব করিল, তাই তাহার মুখখানি আরও কাছে টানিয়া লইয়া বলিল, 'চাহিয়া দেখ,—তুমি আমার কলঙ্ক নহ—তুমি আমার শোভা! তুমি চাঁদের পূর্ণবিকশিত, উজ্জ্বল কৌমুদী!'

চক্ষু চাহিতে মেরির কিন্তু সাহস হইল না। কতক্ষণ হয়ত এইভাবে কাটিত, কিন্তু এই সময় অদূরস্থিত গির্জার ঘড়িতে ঢং করিয়া একটা বাজিল। মেরি চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া ব্যস্ত হইয়া কহিল, 'সময় হইয়াছে—চল!'

'আমার যাওয়া একেবারে অসম্ভব।'

'কেন?'

'এই পুস্তক পাঁচ দিনের মধ্যে শেষ করিয়া পাঠাইব বলিয়া চুক্তি করিয়াছি,—চুক্তিভঙ্গ হইলে বড় লজ্জায় পড়িব।'

মেরি রাগ করিয়া বলিল, 'তা বলিয়া আমি তোমাকে প্রাণপাত করিয়া পরিশ্রম করিতে কিছুতেই দিব না।'

লিওর মুখে ম্লান ছায়া পড়িল: পিতৃঋণ স্মরণ করিয়া বলিল 'আমার অদৃষ্ট! কি করিব মেরি, পরিশ্রম করিতেই হইবে।'

মেরি তাহার মনের কথা বুঝিল, তাই আরো রাগ হইল। বলিল, 'তোমার পুস্তক আমাকে বিক্রয় করিও—আমি দ্বিগুণ মূল্য দিব।'

লিওর তাহাতে সন্দেহ ছিল না; হাসিয়া বলিল, 'কিন্তু কি করিবে?'

মেরি নিজ গলদেশের বহুমূল্য মুক্তামালা দেখাইয়া বলিল, 'এই মালা ছিন্ন করিয়া ফেলিব,—যতগুলি মুক্তা, যে কয়খানি হীরক আছে সবগুলি দিয়া পুস্তকখানি বাঁধাইয়া সোনার কৌটায় করিয়া মাথার শিয়রে তুলিয়া রাখিব;—তারপর—তারপর—'

লিও বলিল, 'তারপর কি'?

মেরি সলজ্জ হাস্যে রক্তিমাভ মুখখানি ঈষৎ নত করিয়া বলিল, 'তারপর যেদিন রাত্রে খুব বড় চাঁদ উঠিবে, আর তাহার কিরণগুলি তোমার নিদ্রিত মুখের উপর খেলা করিতে থাকিবে, সেই দিন—'

'সেই দিন কি ?'

'সেই দিন খুব উচ্চকণ্ঠে পাপিয়া ডাকিতে থাকিবে, তোমার কিন্তু কিছুতেই ঘুম ভাঙ্গিবে না, আমি তখন তোমার কানের কাছে বসিয়া—' মেরি হাসিয়া ফেলিল।

লিও বলিল,—'আমার কানের কাছে বসিয়া পুস্তকটিতে যতগুলি কথা আছে, সবগুলি পড়িয়া ফেলিবে, না' ?

মেরি মাথা নাড়িয়া বলিল, 'হুঁ।'

আমি তাহা হইলে জাগিয়া এমনি করিয়া তোমার মুখচুম্বন করিব।

তাহার পর দুইজনেই হাসিয়া উঠিল।

ঘড়িতে দেড়টা বাজিয়াছে—লিও তাহা দেখিয়া বলিল. 'ঢের হইয়াছে—এইবার যাও—।'

মেরি জাঁকিয়া বসিল ; বলিল, 'আমার শরীর খারাপ হইয়াছে—আজ যাইব না।'

তা কি হয় ? কথা দিয়াছ, না যাইলে চলিবে কেন ? কত লোক তোমার জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে।

মেরি নিতান্ত অবাধ্যের মত কহিল, 'চুক্তিভঙ্গ হইলে তোমার মত আমার বিশেষ লজ্জাবোধ হয় না—আমি যাইব না।'

'ছিঃ—যাও। অবাধ্য হইও না।'

'তবে তুমিও চল।'

'ক্ষমতায় থাকিলে নিশ্চয় যাইতাম।'

'ক্ষমতায় আছে—চল।

ক্ষমতায় নাই—যাওয়া অসম্ভব।'

মেরি উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, 'তবে আমি আর এখানে আসিব না।'

লিও হাসিয়া বলিল, 'আমি জানি তুমি নিশ্চয় আসবে।'

মেরি রাগ করিয়া বলিল, 'আমি না আসিলে তোমার হয়ত খাইবার অযত্ন হইবে। পোড়াপ্রাণে যে এটা সহ্য করিতে পারি না, না হইলে

নিশ্চয় তুই এক-দিন চুপ করিয়া ঘরের কোণে বসিয়া থাকিতাম।'

'এ ক্ষমতাটুকু যদি নাই, তবে রাগ করিলে চলিবে কেন?'

কথাটার সত্যতা সম্বন্ধে মেরির অণুমাত্র সন্দেহ ছিল না, তাই ক্ষুণ্ণ অন্তঃকরণে গাড়িতে বসিয়া ভাবিল—সে ছেলেবেলায় পড়িয়াছিল যে, উদরের উপর নাকি একদিন হাত-পাগুলা বড় চটিয়া গিয়াছিল—কিন্তু ফল বিশেষ তৃপ্তিজনক হয় নাই।

মেরি তাই রাগ করিতে পারিল না।

চার

দুইটার কিছু পূর্বে যখন মেরির প্রকাণ্ড জুড়ি গাড়ি প্রান্তরে আসিয়া উপস্থিত হইল তখন সমবেত জনমণ্ডলী বিপুল কলরবে কোলাহল করিয়া উঠিল। সে সুন্দরী, সে যুবতী, সে অবিবাহিতা, এবং বিপুল ধনের অধিকারিণী; মানবের যৌবনরাজ্যে তাহার স্থান অতি উচ্চে, এখানেও বহু মানের আসনটি তাহারই জন্য নির্দিষ্ট হইয়াছিল। সে আজ পুষ্পমাল্য বিতরণ করিবে। তাহার পরে যে তাহার শিরে জয়মালাটি প্রথম পরাইতে পারিবে জগতে সেই ভাগ্যবানের অদৃষ্ট আজ হিংসা করিবার একমাত্র বস্তু। সওয়ারগণ রক্তবর্ণ পোশাকে সজ্জিত অশ্বপৃষ্ঠে উৎসাহের বেগ ও চাঞ্চল্য কষ্টে সংযম করিয়া অপেক্ষা করিতেছিল। দেখিলে বোধ হয় তাহারা যেন পর্বতও ভেদ করিতে সক্ষম;- মেরি উপস্থিত হইয়াছে, নির্দিষ্ট সময়ও আসিল,- পিস্তলের শব্দে সকলেই ব্যগ্র হইয়া দেখিল অশ্বশ্রেণী প্রাণপণে ছুটিয়া চলিয়াছে। তাহার পর মেরির নিকট আসিয়া তাহারা অশ্ব সংযম করিল, নিমেষের মধ্যে এক একটি পুষ্পমাল্য হাতে লইয়া আবার ঘোড়া দৌড়াইয়া দিল।—মরিবার সময়টুকু পর্যন্ত তাহাদের নাই। প্রাণ তাহাদের নিকট আজি নিতান্ত তুচ্ছ—শুধু এক কথা মনে জাগিতেছে, কে সর্বপ্রথমে মেরির হস্তে মালা ফিরাইয়া দিতে পারিবে। প্রতি অঙ্গচালনায় শুধু ঐ এক ভাব;- মৃত্যু কিংবা সম্মান! মেরি মনে

করিল, সে-ই আজি তাহাদিগের একমাত্র লক্ষ্য। শুধু তাহার নিকট অগ্রে আসিবার জন্য তাহারা প্রাণ দিতে পারে। বালিকাসুলভ আনন্দে এবং যৌবনের চাপল্যে তাহার বুকখানি ঈষৎ ফুলিয়া উঠিল।

ঘোড়া ছুটিয়াছে, সকলেই ব্যগ্রতার সহিত অপেক্ষা করিয়া আছে। কেহ কহিল, ডেভিড প্রথম হইবে; কেহ কহিল, চার্লস আগু হইয়াছে। বিদ্যুতের মত তাহারা অভীষ্ট স্থানে আসিতেছে। ঐ ডেভিড পিছাইয়া পড়িল, চার্লস অগ্রে আসিয়াছে—কেহ কহিল, এখনও কিছু বুঝিতে পারা যায় না; কিন্তু তাহা মুহূর্তমাত্র—পরক্ষণেই স্পষ্ট দেখা গেল, ডেভিড প্রভৃতি পিছাইয়া পড়িয়াছে। চার্লস বিদ্যুতের মত ছুটিতেছে তাহাব পর অশ্বপৃষ্ঠে থাকিয়াই সে সর্বপ্রথম পুষ্পমাল্য মেরির পদতলে নিক্ষেপ করিল। খুব কোলাহল হইল, অসংখ্য করতালি শব্দ বহু দূর পর্যন্ত প্রতিধ্বনিত হইল। চার্লস প্রথম হইয়াছে, মেরি সসম্মানে তাহার হস্ত গ্রহণ করিল।

তাহার পর দ্বিতীয় রেস হইবে,—নওয়ারগণ স্ব স্ব অশ্বে স্থান গ্রহণ করিল। পিস্তলের শব্দে সকলেই কশাঘাত করিয়া অশ্ব ছুটাইয়া দিল—মেরির নিকট হইতে মাল্যগ্রহণ করিবার জন্য সকলেই ছুটিয়া আসিল, সেবার কিন্তু অসাবধানবশতঃ চার্লস নীচে পড়িয়া গেল, পশ্চাতের অশ্ব তাহার পদদ্বয়ের উপর দিয়া প্রবল বেগে ছুটিয়া গেল—যাহারা নিকটে থাকিয়া তাহা দেখিল, তাহারা সকলেই চীৎকার করিয়া উঠিল, কিন্তু চীৎকার শব্দ থামিবার পূর্বেই চার্লস লম্ফ দিয়া পুনর্বার অশ্বারূঢ় হইল। পদদ্বয়ে দারুণ আঘাত পাইয়াছে সত্য, কিন্তু তাহাতে সে ভ্রূক্ষেপও করিল না। অপরাপর অনেকেই চার্লসের জন্য শঙ্কিত হইল, দারুণ আঘাতবশতঃ যদি অশ্বপৃষ্ঠে স্থান না রাখিতে পারে! অজ্ঞাতসারে মেরিও এ সন্দেহ এবং শঙ্কা হৃদয়ে স্থানদান করিল,—প্রথম কারণ তাহার হৃদয় স্বভাবতঃ কোমল, পরদুঃখে শীঘ্রই আর্দ্র হইয়া যায়, দ্বিতীয় কারণটি তাহার বংশগত। বালিকাকাল হইতে সে বীরত্বের বড় পক্ষপাতী, তাহার পিতা পিতামহ প্রভৃতি সকলেই যুদ্ধব্যবসায়ী ছিলেন। এ সকল গল্প

সে বাল্যকালে পিতার নিকট শুনিতে পাইত : অশ্বচালনা যুদ্ধের একটি অংশ :—ইহাতে কত দৃঢ়তা, সাহস এবং সহিষ্ণুতা প্রয়োজন। যাহা যুদ্ধের অংশ, তাহাই গৌরবের সামগ্রী। সম্মানের নিকট যুদ্ধ-ব্যবসায়ীরা প্রাণকেও নিতান্ত তুচ্ছ জ্ঞান করে, আজ শুধু সম্মানলাভের জন্যই চার্লস এ আঘাত তুচ্ছ জ্ঞান করিয়াছে– হয়ত বা সে প্রাণ হারাইবে। মেরি শিহরিয়া উঠিল। একমাত্র যাহার হস্তগ্রহণ করিয়া সম্মানিত করিয়াছে, সে হয়ত প্রাণত্যাগ করিবে ; এরূপ চিন্তা হৃদয় প্রফুল্লকারী নহে, তাই অত্যন্ত আগ্রহ এবং ভীতির সহিত মেরি দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল ; চার্লসের নিরাপদ প্রত্যাবর্তনের জন্য মনে মনে প্রার্থনা করিল। তাহার পর বড় কোলাহল হইতে লাগিল ; দূরবীন লাগাইয়া অনেকেই দেখিল চার্লস পুনর্বার অগ্রে আসিতেছে ; কিন্তু ইতিমধ্যে মেরি মনে মনে আপনাকে এই অল্প সময়ের মধ্যেই চার্লসের সহিত এরূপ জড়িত করিয়া লইয়াছিল, যে, তাহার এই দুঃসাহসিক কার্যের জন্য আপনাকে নিতান্ত গৌরবান্বিত এবং শ্লাঘ্য বলিয়া বোধ করিল। বাস্তবিক সেবারেও চার্লস জয়ী, হইল,—আনন্দে মেরির সহসা বাক্য নিঃসৃত হইল না, পরে নিজের গলদেশ হইতে ঘড়ি ও চেন খুলিয়া লইয়া তাহার গলায় পরাইয়া দিয়া কহিল, 'তুমি এ গ্রামের রত্ন, তোমার মত সাহসী যুবা আর কেহ নাই।' চার্লস স্মিতমুখে এ প্রশংসা গ্রহণ করিল।

সে রাত্রে মেরি সকলকেই নিমন্ত্রিত করিল, সন্ধ্যার পর তাহার বাটীতে খুব সমারোহে ভোজন ব্যাপার সমাধা হইতে চলিল ; আহারে বসিয়া মেরি চার্লসের পার্শ্বে উপবেশন করিয়া, মৃদুকণ্ঠে কহিল, 'তোমার জন্য বড় ভয় পাইয়াছিলাম।'

চার্লস ঈষৎ হাসিয়া বলিল, 'কেন ?'

'বড় কঠিন আঘাত লাগিয়াছিল,—তুমি ভিন্ন আর কেহ বোধহয় অশ্বপৃষ্ঠে স্থান রাখিতে পারিত না।'

চার্লস বিনয়নম্রকণ্ঠে কহিল, 'আমার আঘাত আরোগ্য হইয়াছে ; আমার জন্য তুমি দুঃখিত হইয়াছিলে, এমন সৌভাগ্য পূর্বে কখন হয় নাই

—এত আনন্দও কখনও অনুভব করি নাই—। তোমার করুণা পাইবার জন্য আমি একটা পা কাটিয়া দিতে পারিতাম; আঘাত ত তুচ্ছ কথা!'

সে রাত্রে অনেক শেরি, শাম্পেনের শূন্যগর্ভ বোতল ভূমিতলে লুটাইয়া পড়িল; গভীর রাত্রি পর্যন্ত আপনার পাঠাগারের জানালায় বসিয়া দুঃখিত অন্তঃকরণে লিওপোল্ড বিকৃত জড়িত কণ্ঠের গীতধ্বনি শ্রবণ করিল; পিয়ানোর শব্দ ঝমঝম করিয়া আকাশে উঠিল; কর্কশ কণ্ঠের সহিত মধুর কণ্ঠও কয়েকবার মিশ্রিত হইল। জানালা বন্ধ করিয়া লিও শয্যাশ্রয় করিল,—আজ হৃদয়ে একটু যাতনা বোধ হইতেছিল।

পাঁচ

পরদিন মেরি লিওকে বলিল, 'কাল আমাদের বাটীতে কেমন উৎসব হইয়া গেল, তোমার সময় ছিল না বলিয়া তোমাকে ডাকি নাই।'

লিও হস্তস্থিত কলম দোয়াতের উপর রাখিয়া দিয়া কহিল, 'ভালই করিয়াছিলে—কিন্তু আমারও কাল রাত্রে কিছুই কাজ হয় নাই, কিছু ক্ষতি হইয়াছে।'

মেরি মুখপানে চাহিয়া বলিল, 'কেন কাজ হয় নাই?'

লিও কলম তুলিয়া লইল, পুস্তকে মনঃসংযোগ করিবার উপক্রম করিয়া বলিল, 'সে কথা তুলিয়া কাজ নাই, আমি বলিতে পারিব না।'

এরূপ কথা জীবনে মেরি এই প্রথম শুনিল। বিস্মিত হইয়া বলিল, 'কেন?'

'তা জানি না; বোধহয় মন কিছু নীচ হইয়া পড়িয়াছে।'

তাহার পর মেরি অনেকক্ষণ বসিয়া রহিল, অনেক কথা মনে মনে তোলাপড়া করিল, কিন্তু লিও আর মুখ তুলিল না, কোন কথাই জিজ্ঞাসা করিল না।

মেরি যাইবার সময় বলিল, 'যাইতেছি।'

'যাও।'

যাইবার সময় তাহার বোধ হইল যেন সে লিওর মনের কথা কতক বুঝিতে পারিয়াছে, কিন্তু প্রতিপন্ন করিবার উপায় নাই—শুধু অনুমান করা যায় মাত্র। যাহা হউক, ক্ষুদ্র পথটুকু সে বড় অন্যমনস্কভাবে অতিক্রম করিল। বাটীর ভিতর প্রবেশ করিবার সময় ভৃত্য একখানা টিকিট হাতে করিয়া কহিল, চার্লস বসিবার কক্ষে অপেক্ষা করিতেছেন।

মেরি ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিল, 'কেন?'

'তাহা জিজ্ঞাসা করি নাই,—জিজ্ঞাসা করিয়া আসিব কি?'

মেরি একটু ভাবিয়া বলিল, 'থাক, আমি নিজেই যাইতেছি।'

চার্লসের বিশেষ কিছুই কাজ ছিল না। সে শুধু গত নিশির আমোদ-উৎসবের জন্য ধন্যবাদ দিতে আসিয়াছিল। মেরি কক্ষে প্রবেশ করিলে সে অতিশয় ভদ্রতার সহিত অভিবাদন করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। মেরি হাত ধরিয়া অতিথিকে বসাইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিল,—কারণ পূর্বেই বলিয়াছি, কিন্তু কথায় কথায় তাহা একটু অন্যরকমে দাঁড়াইতে চলিল।

মেরির কত ঐশ্বর্য, কত বিষয়-আশয়, কত মান-সম্ভ্রম! এই ত হইল প্রথম; তাহার পর মেরি কত উচ্চবংশীয়া, তাহার পিতা কত বড় বীর এবং সজ্জন ছিলেন—রাজদ্বারে তাঁহার যে পরিমাণ সম্ভ্রম ছিল সে পরিমাণের সম্ভ্রম অর্জন করিতে বিশেষ বুদ্ধি, বিবেচনাশক্তি, রাজনৈতিক জ্ঞান প্রভৃতির প্রয়োজন, মেরির পিতা Captain নোলের তাহা কিছুমাত্র কম ছিল না; এক কথায় আজকাল সেরূপ আর মিলে না। কিন্তু শেষের কথাগুলি আরও উচ্চ অঙ্গের, মেরির তাহা খুব ভাল লাগিতেছিল,—সেটা অন্য কিছু নয়, শুধু তাহার নিজের রূপ এবং যৌবনের ব্যাখ্যা এবং পক্ষপাত সমালোচনা। পুরুষের মুখে এ কথাগুলা স্ত্রীলোকের সর্বাপেক্ষা তৃপ্তিকর বোধ হয়, এ কথার কাছে আর কিছুই নয়। তাই কতক্ষণ দুইজনে নির্জন কক্ষে গল্প করিয়া অতিবাহিত করিল তাহা মেরি বুঝিতে পারিল না। ঘড়িতে যখন দুইটা বাজিল তখন চার্লস বিদায় হইল এবং যাইবার সময় সেই দিন সান্ধ্যভোজনের

নিমন্ত্রণও লইয়া গেল।

সে চলিয়া গেলে, এই রূপ এবং ঐশ্বর্যের কাহিনীর তরঙ্গগুলা যখন অল্পে অল্পে শান্ত হইয়া আসিতে লাগিল, এবং তাহার প্রতিধ্বনিগুলা মেরির মস্তিষ্কের ভিতর ঠোকাঠুকি করিয়া ক্রমশঃ হীনবল হইয়া ধীরে ধীরে শূন্যে মিলাইয়া যাইতে লাগিল এবং যে অবশিষ্ট স্পন্দনটুকু নাচিয়া বেড়াইতেছিল, তাহাও যখন অন্য আর একটি অসীম সৌন্দর্যের পার্শ্বে কাতরভাবে ছুটিয়া পলাইবার প্রয়াস করিতে লাগিল, তখন তাহার বোধ হইল এই ঝোঁকের উপর আকস্মিক নিমন্ত্রণকার্যটা তেমন যুক্তিসঙ্গত হয় নাই। সন্ধ্যার পর সে আসিবে, দুইজনে একত্র আহার করিতে হইবে, হয়ত বা আর কেহই থাকিবে না, কত গল্প কত কথা বলিবার ও শুনিবার উপায় থাকিবে, কিন্তু মেরির তাহাতে আর তেমন মন উঠিল না। যদি আর কেহ জানিতে পারে? যদি তাহার ক্লেশ বোধ হয়? চঞ্চল হস্তে মেরি এক খণ্ড কাগজ লইয়া লিখিল, 'তুমি সন্ধ্যার পর আসিও না, আমার শরীর মন্দ বোধ হইতেছে।' কিন্তু এ পত্র চার্লসের নিকট পাঠাইতে লজ্জা বোধ হইল। অনেক চিন্তা করিয়া মেরি অবশেষে এইরূপ লিখিল 'যখন আসিবে তখন আর তিন চারিজন বন্ধুকে আনিও। আনিতে পারিলে নিতান্ত সন্তুষ্ট এবং সুখী হইব।' ভৃত্য পত্র লইয়া চলিয়া গেল।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও সে রাত্রে চার্লস আরও দুই-তিনজন বন্ধুকে সঙ্গে আনিল। আহারাদি শেষ করিয়া সকলেই একবাক্যে মেরিকে গান গাহিবার জন্য ধরিয়া বসিল। ইচ্ছা না থাকিলেও অতিথির অনুরোধ রাখিতে হইল; পিয়ানো-এ ঝঙ্কার দিয়া মেরির সুকণ্ঠ দুই-তিনটি সপ্তকেরমধ্যে খেলা করিয়া ছুটিতে লাগিল, উৎসাহ ও আনন্দে চার্লস প্রভৃতি কয়েকবার উচ্চ শব্দ করিয়া উঠিল, কেহ বা আবেগের সহিত দুই-এক পদ সঙ্গে সঙ্গে গাহিয়া ফেলিল। ক্রমশঃ শেরি হুইস্কি, ব্র্যাণ্ডি ও রমের শূন্যগর্ভ বোতলগুলির সংখ্যা যত বৃদ্ধি হইয়া চলিল, উৎসাহ, আবেগ উচ্চস্বর ততই পরিপূর্ণভাবে নৈশ আকাশে ঠেলিয়া ফুঁড়িয়া উঠিতে লাগিল। জানালার ভিতর দিয়া এ শব্দ লিওর পাঠাগারে যে

একদম প্রবেশ করে নাই তাহা নহে, কিন্তু ইচ্ছাপূর্বক আজ লিও জানালাগুলা একেবারে বন্ধ করিয়া দিয়াছিল। শব্দ-সাড়াগুলা সেখানে তেমন গোলযোগ করিতে পারিতেছিল না।

এদিকে গাহিতে গাহিতে মেরির কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া আসিতেছে, পার্শ্বেও চার্লস কিংবা আর কেহ শেরির গ্লাস লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। ক্রমাগত শেরি গ্লাসের মুখচুম্বন করিয়া মেরির গলাটা নিতান্ত সরস এবং মস্তিষ্ক অত্যন্ত সজীব হইয়া উঠিল। উৎসাহের সহিত গভীর রাত্রি পর্যন্ত পিয়ানোর ঝঙ্কার উঠিতে লাগিল।

শেষ হইলে, শয্যায় শয়ন করিয়া সেদিনের মত আজ আর নিদ্রা আসিল না; মেরি অনেক কথা ভাবিল। পুরুষের দল তাহার বড় প্রশংসা করিয়াছে—কেমন করিয়া তাহার শুভ্র পুষ্পকোরকতুল্য অঙ্গুলি কি-বোর্ডের উপর বিদ্যুৎ গতিতে ছুটিয়া যাইতেছিল এবং অঙ্গুলি সংলগ্ন বৃহৎ হীরক-অঙ্গুরীয় মধ্যে মধ্যে ঝকঝক করিয়া এক শোভা দশগুণ করিয়াছিল; কিন্তু সহসা মনে পড়িল হয়ত আর একজনের আরও শুভ্র, আরও সুন্দর, কিন্তু ক্লান্ত এবং অবসন্ন অঙ্গুলি দুইটি এখনও নিঃশব্দে কাগজের উপর দিয়া ধীরে ধীরে লিখিয়া চলিয়াছে। সে হয়ত সমস্ত শুনিয়াছে, হয়ত বা ক্লেশ অনুভব করিয়াছে, কিন্তু প্রতিবিধানের উপায় কৈ? মধু থাকিলে মৌমাছি আসিবেই, ধন থাকিলে তাহার চতুষ্পার্শ্বে লোকসমূহ জড় হইবেই, নতুন সম্বন্ধের বন্ধন যৌবনের অঙ্গ জড়াইয়া উঠিবার স্বতঃ প্রয়াস করিবেই—ইচ্ছা থাকিলেও এ বাঁধন নিজ হস্তে খুলিয়া ফেলা যায় না। মেরি কাতরভাবে উদ্ধারের কামনা এবং প্রার্থনা করিতে করিতে সে রাত্রে ঘুমাইয়া পড়িল।

পরদিন সে লিওর কাছে গিয়া বসিল, লিও লিখিতেছে, কৈ একবারও চাহিয়া দেখিল না। অনেকক্ষণ ধরিয়া মেরি কথা খুঁজিয়া পাইল না—তারপর সাহসে ভর করিয়া বলিল, 'তোমার আর কত বাকী আছে?'

'অনেক।'

'আজ দু-তিনদিন ধরিয়া কি লিখিলে? আমাকে শুনাইবে না?'

এই সময়ে অসাবধানতাবশতঃ মুখে অনেকখানি কালি উঠিয়াছিল;

টপ করিয়া একটা বড় রকমের ফোঁটা শুভ্র কাগজের উপর পতিত হইল। লিও খাতাখানা ঈষৎ সরাইয়া কলমের মুখটা মুছিতে মুছিতে বলিল, 'মেরি, তোমার মুখ দিয়া বড় তীব্র সুরার গন্ধ বাহির হইতেছে : গন্ধ আমার সহ্য হয় না—সরিয়া বস। অত কাছে বসিয়া থাকিলে আমার সমস্ত ভুল হইয়া যাইবে।'

এক দণ্ডে মেরির চক্ষু দুটি চকচক করিয়া উঠিল বলিল : 'আমি তীব্র সুরা পান করি নাই।'

'হইতে পারে। কিন্তু আমার নিকট ও গন্ধ বড় উগ্র বোধ হইতেছে : তুমি হয় সরিয়া বস, না হয় গৃহে যাও।'

মেরি উঠিয়া দাঁড়াইল। সে চিরকাল আদর ও যত্নের মধ্যে লালিত পালিত। এরূপ তাচ্ছিল্যের কথা শুনা তাহার অভ্যাস নহে। বড় অপমান বোধ হইল। তাহার সমস্ত হৃদয় আত্মাভিমানে পরিপূর্ণ, তাই এ ক্ষুদ্র যুবার কোমল অথচ রীতিমত দৃঢ় ও নির্ভীক সত্য কথা তাহার সমস্ত শরীরে অকস্মাৎ খর বিষের জ্বালা জ্বালাইয়া দিল। দাঁড়াইবার সময় সে ভাবিয়াছিল, খুব দুটো চড়া কথা শুনাইয়া দিবে ; মিথ্যাবাদী, অকৃতজ্ঞ প্রভৃতি শব্দগুলা আরোপ করিয়া, তাহার বুকে ছুরির মত বিদ্ধ করিয়া দিবে—তারপর যথারীতি খুব একচোট কলহ করিয়া চিরদিনের মত বিচ্ছেদ করিয়া চলিয়া যাইবে, কিন্তু দাঁড়াইয়া উঠিয়া তাহার শব্দ-শাস্ত্রের অভিধানটা একেবারে কোথায় হারাইয়া গেল! ভ্রূ কুঞ্চিত করিল, চক্ষু বিস্ফারিত করিল, দন্তে অধর দংশন করিল কিন্তু কথা বাহির হইল না।

সম্মুখের দর্পণে সে চিত্র লিও দেখিতে পাইল। কাছে আসিয়া মেরির উন্নত গ্রীবার একপার্শ্বে হাত রাখিয়া বলিল, 'অপমান বোধ হইয়াছে?'

মেরির আত্মাভিমান এবার কথা খুঁজিয়া পাইল। তীব্রকণ্ঠে কহিল, 'তুমি নীচ এবং ঈর্ষাপরবশ, তাই অপমান করিলে।'

লিও ধীরে ধীরে সরিয়া গেল। কহিল, 'মেরি, জগতের মধ্যে ঐ দুটি কথা আমার সহ্য হয় না। অমন কথা আর মুখে আনিও না।

তুমি অধঃপথে যাইতেছ, তাই সাবধান করিতে চাহিয়াছিলাম, কিন্তু তাহার পরিবর্তে ওরূপ মর্মান্তিক কথা শুনিবার বাসনা রাখি না।'

মেরি আরও ক্রুদ্ধ হইল। বলিল, 'অধঃপথে কি করিয়া গেলাম?

'আমার তাই মনে হয়। ভদ্রঘরের স্ত্রীলোক, বিশেষত তুমি একান্তে অত রাত্রি পর্যন্ত যে আমোদ-প্রমোদ করিবে আমার সেটা ভাল বোধ হয় না। লোকেই বা কি বলিবে?'

আবার লোকের কথা! মেরি অস্থির হইয়া উঠিল! কহিল, লোকে কিছুই মনে করে না। তুমি দরিদ্র কিন্তু আমার ধন ঐশ্বর্য আছে, তোমার মত অনবরত পরিশ্রম করিয়া আমার খাদ্য সংগ্রহ করিতে হইবে না, তোমার মত নির্জন গৃহে বসিয়া জনসমাজের নিকট অপরিচিত থাকিলেই বরং লোকে মন্দ বলিবে।' তাহার পর একটু বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া বলিল, 'লিও, আপনার ভাগ্য দিয়া আমার ভাগ্য গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিও না—পিতা আমার জন্য অভিশাপ এবং মর্মপীড়া রাখিয়া যান নাই—যাহা সুখের, যাহা বাঞ্ছিত, সমস্তই যথেষ্ট দিয়া গিয়াছেন। যাহার এত আছে তাহার পক্ষে দু-দশজন বন্ধুবান্ধবকে নিমন্ত্রণ করিয়া আমোদ-প্রমোদ করিলে কেহই দুষে না।'

এত কথা মেরি কহিতে জানে, লিও তাহা জানিত না; এত স্নেহ, এত করুণা যে এত তীব্র বিষ ঢালিয়া তাহার সমস্ত চৈতন্য ওলটপালট করিয়া দিতে পারে, সে ধারণা লিও করিতে পারে নাই—তাই নিতান্ত নির্জীব অবসন্নভাবে বসিয়া পড়িল। কোন উত্তর বা কোনরূপ প্রতিবাদ খুঁজিয়া পাইল না। রাগের মাথায় মেরি চলিয়া গেল, তাহা সে দেখিল কিন্তু ফিরাইতে পারিল না, ইচ্ছাও বড় বেশি ছিল না, কিন্তু দুটো কথা বলিতে পারিলে বোধ হয় ভাল হইত।

আপনার কক্ষে পৌঁছিয়া মেরি, একখণ্ড রুমালে মুখ আবৃত করিয়া একটা সোফার উপর বসিয়া পড়িল—সমস্ত শরীরে অগ্নির উত্তাপ বাহির হইতেছে।

এই সময় একজন ভৃত্য আসিয়া কহিল, চার্লস অপেক্ষা করিতেছেন।

মেরি মুখ তুলিয়া তাহার পানে তীব্র কটাক্ষ করিয়া কর্কশ-কণ্ঠে

কহিল, 'তাড়াইয়া দাও।'

ভৃত্য অবাক হইয়া গেল। কিছুক্ষণ নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া চলিয়া গেল; চার্লসের নিকটে গিয়া কহিল, 'শরীর খারাপ, এখন দেখা হইবে না।'

চার্লস উৎকণ্ঠিতভাবে নানারূপ প্রশ্ন করিল। কখন শরীর খারাপ হইয়াছে, কেমন করিয়া হইল, কতক্ষণে সারিবে—ইত্যাদি অনেক কথা এক নিঃশ্বাসে কহিয়া গেল। উত্তর পাইল না। সভ্য তিরস্কৃত হইয়া ভৃত্য মহাশয় কিছু চটিয়াছিলেন; কিন্তু তিরস্কার যে তাহাকে করা হয় নাই, সে কথা সে বুঝিল না। বলিল, 'আমি অত জানি না।'

হতাশ হইয়া চার্লস একটা ফুলের তোড়া তাহার হাতে দিয়া বলিল, 'আমার নাম করিয়া এইটা দিও।'

ভৃত্য পার্শ্বের টেবিলে তাহা রাখিয়া দিয়া বলিল, তিনি নীচে আসিলে দিব।'

ছয়

প্রায় এক মাস অতীত হইল কেহই কাহারো সহিত সাক্ষাত করিল না। মেরি মনে করে যে, তাহার বাল্যসখাটি তাহার শরীরের ও মনের চতুষ্পার্শ্বে যে মমতার আবরণে ঢাকিয়া দিয়াছিল, তাহা অল্পে অল্পে সে কাটিয়া ফেলিয়াছে; আর তাহার উপর কোন স্নেহ নাই, মায়া নাই—একবিন্দু সম্বন্ধ পর্যন্ত নাই। এই এক মাসের মধ্যে সে এই কথাগুলি নিশিদিন ধরিয়া মনে মনে তোলাপাড়া আলোচনা করিয়া দেখিয়াছে, কিন্তু যত অধিক সে এ বিষয় আলোচনা করিয়াছে, তত বেশী সে আপনাকে প্রতারিত করিয়াছে। নিজের হৃদয়ের তলায় সে একদিনও প্রবেশ করে নাই, করিলে দেখিতে পাইত যে, সেখানে শুধু লিও আর নিজে অষ্টপ্রহর মুখোমুখি করিয়া বসিয়া আছে। প্রেমালাপ করিতেছে না—কলহ করিতেছে। উঠিতে বসিতে সে সর্বদাই চিন্তা করে, কি করিলে এ কলহটা আরও পাকাইয়া তুলিতে পারা যায়, কিরূপ নিত্য নব উপায় উদ্ভাবন করিতে পারিলে লিওর বিরক্তি আরও একটু সজীব

করিয়া তুলিতে পারা যায়। কিরূপ আচার-ব্যবহার আরম্ভ করিলে তাহাকে আরও একটু ম্রিয়মাণ করা যাইতে পারে। ইতিমধ্যে আরও দুই-একবার ভোজন উৎসবাদি সমাধা হইয়াছে, ব্যয়বাহুল্য এবং আয়োজনাদির পারিপাট্য দেখিয়া গ্রামের লোক কত সুখ্যাতি করিয়াছে, কিন্তু তাহাতে তাহার মন নাই। মানস-চক্ষে সে শুধু দেখিতে চাহে, এ-সকল কাহিনী শুনিয়া লিওর মুখ কিরূপ বিশুষ্ক এবং পাণ্ডুবর্ণ হইয়াছে, কর্ণে শুনিতে চাহে, লিও কিরূপ ফুলিয়া ফুলিয়া হৃদয়ের যন্ত্রণায় দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিতেছে। এত অর্থব্যয় বুঝি তাহা হইলে সার্থক হয়। অর্থব্যয়ের কারণ ঐ লিও এবং উদ্দেশ্য তাহার যাতনা বৃদ্ধি করা :—কিন্তু সফলতার কথা কেহ বলে না। এ কথা কাহাকেও জিজ্ঞাসা করা যায় না—কিন্তু এমন কি কেহ নাই, এমন কি কোন সর্বদর্শী অন্তর্যামী পদার্থ নাই, যাহা এ কথা বলিয়া যাইতে পারে? মেরি অন্যমনস্কভাবে এই সব ভাবে। কিন্তু যখন মনে হয়, লিও তাহার পুষ্পের মত শুভ্র শান্ত দেহটি লইয়া হৃদয়ের মধ্যে জগতের শক্তি এক করিয়া পর্বতের মত দৃঢ় হইয়া আছে, এত সমারোহ, হট্টগোল তাহার হৃদয়ের দ্বারে আঘাত খাইয়া ঠিকরিয়া পড়িতেছে, ভিতরে একটিবারও প্রবেশ করিতে পারিতেছে না; হয়ত বা সে-হৃদয়ে জ্বালার পরিবর্তে অবহেলা ও ঘৃণার স্থান হইয়াছে, তখন মেরির সমস্ত শিরা, অস্থি, মজ্জা—যাহা কিছু আছে সমস্ত এক সাথে ঝমঝম করিয়া সুরে-বেসুরে নিতান্ত একটা অবসন্ন হতাশ ছবি চক্ষের উপর দাঁড় করাইয়া দেয়। উৎসবরাত্রে যখন সকলে ব্যস্তভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, বাটীময় সাড়াশব্দে পূর্ণিত, শিখরে শিখরে উৎসবের সহস্র দীপ দৈত্যরাজার প্রমোদভবনের মত শোভা পাইতেছে—হয়ত সে সময়ে মেরি একটু নির্জনে বসিয়া একটা অপরূপ বিষাদচিত্র মনে মনে আঁকিতেছে। ভাবিতেছে, লিও হয়ত এতক্ষণে তাহার নৈশ কার্য শেষ করিয়া শীতল বায়ুর জন্য একটিবার মাত্র জানালা খুলিয়াছে; উৎসবের দীপমালা চক্ষে পড়িয়াছে—কিন্তু নিমেষের জন্য! নিতান্ত অবজ্ঞাভরে জানালা রুদ্ধ করিয়া পরক্ষণেই সে নিতান্ত নিশ্চিত মনে আপনার স্নিগ্ধ শয্যাতলটি আশ্রয় করিয়া শুইয়া আছে,—নিদ্রাদেবী পদ্মহস্তে তাহার

পদ্মের মত দুটি চক্ষের উপর হাত বুলাইয়া তাহাকে নিদ্রিত করিতেছেন। মেরি ছটফট করিয়া উঠিয়া পড়িল,—ভাবিল, সে নিজে? নিজের কথা নিজেই বুঝে না—মনে হয়, এত উৎসব-সমারোহ মিথ্যা পণ্ডশ্রম মাত্র! লিওর গ্রাহ্যের মধ্যেও আসে না।

জ্বালার উপর জ্বালা, মেরি ধনবতী কিন্তু লিও দরিদ্র, তাহার সহায় সম্পদ আছে, লিওর কিছুই নাই, জনসাধারণ তাহাকে কত খাতির যত্ন করে, লিওকে কেহ চিনে না, তবুও সে এত উচ্চে বসিয়া আছে যে, মেরি তাহার যথাসর্বস্ব ব্যয় করিয়াও তাহার কাছে ঘেঁষিতে পারিতেছে না। তাহার রূপ যৌবন ঐশ্বর্যের পদতলে কতলোক নিত্য আসিয়া মাথা নত করিতেছে, স্বেচ্ছায় অযাচিত আপনাকে বিক্রয় করিবার জন্য তাহার পানে ঈষৎ সঙ্কেতের অপেক্ষামাত্র করিয়া দীন নয়নে চাহিয়া বসিয়া আছে, কিন্তু এই ক্ষুদ্র দারিদ্র্যপীড়িত, পরিশ্রমক্লিষ্ট, অসহায় অলৌকিক জীবটি একবার ফিরিয়াও দেখে না। সে ধরিতে চাহে না, ধরা দিতেও চাহে না। রাগের মাথায় মেরি আকাশের গায়ে থুথু ফেলিত। লিওর স্থান বড় উচ্চে, সেখানে এ-সব পৌঁছিত না, শুধু মেরির মুখে-চোখেই তাহা ফিরিয়া আসিত। দ্বিগুণ জ্বালায় সে আপনি জ্বলিয়া মরিত।

সাত

নিজের জন্মতিথি উপলক্ষে বাটীতে আজ মহোৎসবের বিপুল আয়োজন হইতেছে, প্রতি বৎসরই ইহা হইত, কিন্তু এবার জাঁকজমক কিছু বেশি। সমস্ত বাটীময় ফল, ফুল ও রংদার পাতায় সাজান হইতেছে, সহস্র দীপ নানাবর্ণ বিচিত্র কাচপাত্রের ভিতর সজ্জিত হইয়া শুধু রাত্রির জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে। গ্রামের সমস্ত সম্ভ্রান্ত স্ত্রী-পুরুষগণ নিমন্ত্রিত হইয়াছেন; এই সময় লণ্ডন নগরে কে একজন প্রসিদ্ধ জাদুকর আসিয়াছিল, বহু অর্থ ব্যয় করিয়া সে-রাত্রের জন্য তাহাকে নিযুক্ত করা হইয়াছে।

বাজিকরের বাজি দেখিবার জন্য সন্ধ্যার পূর্ব হইতেই অনেকে ধীরে ধীরে জমা হইতেছে। যাহার শরীর অসুস্থ সেও রীতিমত গরম কাপড়ে আপাদমস্তক মুড়ি দিয়া সন্ধ্যার মধ্যেই উপযুক্ত স্থান দখল করিয়া বসিয়াছে কথা ছিল সাতটার গাড়িতে বাজিকর আসিবে এবং আধ-ঘণ্টার মধ্যেই তাহার বিদ্যা হস্তকৌশল ইত্যাদি পরিদর্শন করাইবে; তাহার পর দশটার সময় ভোজনাদি হইবে। সাড়ে-সাতটার জন্য সকলেই উৎসুক হইয়া ছিল, কিন্তু সাতটার সময় একটা অসম্ভব ঘটনা ঘটিল। বাজিকরের পরিবর্তে একখানা টেলিগ্রাফ আসিয়া উপস্থিত হইল। 'জাদুকর হঠাৎ বড় পীড়িত হইয়াছে—আসিতে পারিবে না।' সঙ্গে সঙ্গে মেরির মাথাটা ঘুরিয়া গেল। এখন উপায়? দক্ষিণ হস্তে চার্লসের হস্তে কাগজখানা দিয়া বলিল, 'যাহা হয় কর! কেহ আমার কথা জিজ্ঞাসা করিলে বলিও, সহসা পীড়িত হইয়া শয্যা আশ্রয় করিয়াছি।'

টেলিগ্রাফ পড়িয়া চার্লসও বিষম অভিভূত হইল; সেও কহিল, 'উপায়? সাতটা হইতে দশটা পর্যন্ত কাটে কিরূপে?'

আপাততঃ এ কথা চাপা রহিল। ক্রমশঃ লোকে হল্ পূর্ণ হইয়া গেল। আগ্রহ এবং উৎকণ্ঠা সকলের মুখে: ক্রমে যত সময় যাইতে লাগিল, তত সকলে ব্যস্ত হইতে লাগিল। যাহারা কিছু অসুস্থ ছিল, তাহারা গৃহে প্রত্যাগমনের উপায় খুঁজিতে লাগিল। সর্বত্রই একটা অস্ফুট চাপা কলরব হইতে লাগিল, ভাবগতিক দেখিয়া মেরির নিজের কেশ উৎপাটন করিবার ইচ্ছা হইল। ক্রমশঃ কথাটা জানাজানি হইল —তখন হতাশ হইয়া কেহ বা সংগীতের কথা উত্থাপন করিল, কোন বৃদ্ধ বা তাহার সঙ্গিনীকে হুইস্ট টেবিলের দিকে টানিয়া লইয়া গেল, কোন যুবক তাহার বন্ধুর হাত ধরিয়া ধীরে ধীরে বিলিয়ার্ড হলের দিকে চলিল,—এইরূপে সাতটা হইতে দশটা পর্যন্ত কেমন করিয়া কাটান যাইতে পারে তাহা সবাই ভাবিতে বসিল। সকলকে অন্য কোন উপায়ে নিযুক্ত রাখিবার কোনরূপ আয়োজন করিয়া রাখা হয় নাই

বলিয়া মেরি মৃদুকণ্ঠে চার্লসকে অনুযোগ করিল, কিন্তু উপায় কেহই উদ্ভাবন করিতে সমর্থ হইল না।

আপাদমস্তক আলস্টারে আবৃত করিয়া আজ লিওপোল্ড আসিয়াছিল। হলের এক কোণে একটা সোফায় বসিয়া নিকটস্থ একজন যুবতীর সহিত বাক্যালাপ করিতেছিল। জিজ্ঞাসা করিল, 'জাতুকর আসিল না কেন?'

যুবতী কহিল, 'তাহার সহসা পীড়া হইয়াছে।'

'তাহা হইলে?'

'তাহা হইলে আর কি? দশটা পর্যন্ত যাহার যাহা খুশি করুক: মেরির অবস্থা বড় শোচনীয় হইয়াছে—সে অতিশয় লজ্জিত হইয়া পরিয়াছে।'

লিও একটু ভাবিয়া বলিল, 'আমি গাহিতে জানি। বোধ হয় নিতান্ত মন্দ শুনাইবে না,—কি বল?'

রমণীটি অতিশয় সংগীতপ্রিয়। সে একেবারে লিওর হাত ধরিয়া পিয়ানোর নিকট টানিয়া আনিয়া বসাইয়া দিল। স্বহস্তে ডালা খুলিয়া দিয়া বলিল, 'বাজাও।'

পিয়ানো ডাকিয়া উঠিল—'ঝম ঝম ঝম!'

অনেকেই এখনো এদিকে চাহে নাই, পিয়ানোর শব্দে তাহারা ফিরিয়া চাহিল। ঝঙ্কারে ঝঙ্কারে তখন মর্তের পিয়ানো স্বর্গের সংগীত বলিতেছিল। যাহারা বুঝিত, তাহারা বুঝিল এরূপ অলৌকিক ক্ষিপ্রহস্ত, এরূপ পারদর্শী অসামান্য শিক্ষিত অঙ্গুলি বোধ হয় ইতিপূর্বে কখনও এ পিয়ানো স্পর্শ করে নাই। পার্শ্বের কামরায় যাহারা তাস লইয়া বসিয়াছিল তাহার ক্রীড়া স্থগিত করিল; বিলিয়ার্ড হলের দিকে যাহারা পদচালনা করিয়াছিল, তাহারা আপাততঃ দাঁড়াইয়া পড়িল। সকলেই পরস্পরের মুখ চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল 'কে?'

কেহই লিওকে ভাল করিয়া দেখে নাই, তাই কেহই চিনিতে পারিল না; যে চিনিত সে কথা কহিল না। তাহার পর, পিয়ানো যাহা অস্ফুট বলিতেছিল, কণ্ঠ তাহা স্পষ্টতম করিল। সে কণ্ঠের তুলনা হয় না।

অশীতিপর বৃদ্ধও মনে করিল, তাহার জীবনে এরূপ কণ্ঠস্বর শুনে নাই। ধর্মপরায়ণা বৃদ্ধা মনে করিল জগতের শেষ দিনটিতে বুঝি দেবতাগণ এই-রূপ সংগীত করিবেন। লহরে লহরে সে স্বর কক্ষ ভরিয়া আকাশে উঠিতে লাগিল; ঘূর্ণবায়ু যেমন রাস্তার ধূলা, কুটা, তৃণ, কঙ্কর সমস্তই এক সাথে ঘুরাইয়া লইয়া আকাশে উঠে, এ স্বরও তেমনি বালক, যুবক, প্রৌঢ় বৃদ্ধ প্রভৃতি সকলের মন একসাথে উপরে উড়াইয়া চলিল। এরূপ মুগ্ধ করিতে জাদুকর বোধহয় পরিত না। নিস্পন্দ নীরব—কাহারো মুখে কথা নাই, অনেকের শরীরে চৈতন্যের লক্ষণটুকু পর্যন্ত নাই। ঠিক কোন সময়ে গীতটি শেষ হইল, অনেকেই তাহা বুঝিতে পারিল না, তাহার পর পিয়ানো যখন ঝম ঝম ঝম করিয়া তাহার শেষ ঝঙ্কারটুকু মুগ্ধ আকাশের তরঙ্গ শ্রেণীর শেষ গতিটুকু বিতরণ করিয়া স্তব্ধ হইল, তখন সেই আহূত জনমণ্ডলী নিতান্ত উচ্ছৃঙ্খলভাবে একেবারে পিয়ানোর চতুষ্পার্শ্বে ঘিরিয়া দাঁড়াইল, প্রত্যেকে প্রত্যেকের মুখপানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কে?' কেহ উত্তর দিতে পারিল না। লিও নিজের মুখ নীচু করিয়া রাখিয়াছিল। আবার পিয়ানো ঝম ঝম করিয়া উঠিল, নিমেষে মুগ্ধ, বিস্মিত জনমণ্ডলী সরিয়া গেল,—যে যেখানে পাইল স্তব্ধ হইয়া বসিয়া পড়িল, শুনিল নির্জীব পিয়ানো সজীব হইয়া কত কি কথা বলিয়া যাইতেছে, পুনর্বার কণ্ঠস্বর তাহা স্পষ্টতর করিয়া দিল। লিও বিরহের গান গাইতেছিল:—কোন সুদূর সমুদ্রকূলে বসিয়া পরিত্যক্ত রাজকন্যা তাহার প্রণয়ীর জন্য সমুদ্রকে ডাকিয়া বলিতেছে, 'ওগো সমুদ্র আমার স্বামীকে ফিরাইয়া দাও;—ফিরাইয়া দাও;—কোন অতলগর্ভে তাহাকে নিমজ্জিত করিয়া লুকাইয়া রাখিয়াছ: হায় দয়া করিয়া ফিরাইয়া দাও, না হইলে আমাকেও তোমার একটি তরঙ্গ পাঠাইয়া টানিয়া লও। এ দুঃসহ জীবনের ভার আর বহিতে পারি না।' গানের ভাবটা এইরূপ। শ্রোতৃবর্গের মধ্যে কাহার কিভাবে কাটিতেছিল তাহা পূর্বে বলিয়াছি, কিন্তু মেরির কথা বলি নাই। সে এতক্ষণ একটা কোচের বাজুতে মাথা রাখিয়া আকুলভাবে কাঁদিতেছিল। তাহার মনে হইতেছিল—বুঝি তাহার সমস্ত হৃদয়খানা সঙ্গীত হইয়া কাঁদিয়া ফিরিতেছে,—সমুদ্র কি, তাহা সে

জানে না, শুধু আকুল মর্মভেদী ক্রন্দনে দয়া ভিক্ষা চাহিতেছে—সে আমার হারাইয়া গিয়াছে—ওগো, ফিরাইয়া দাও!—ফিরাইয়া দাও!

প্রবল জ্বরে যেমন রোগীর কিছুতেই পিপাসার শান্তি হয় না, তেমনি এই নিমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গের সংগীতের তৃষ্ণা কিছুতেই শান্ত হইতেছে না। একটির পর একটি করিয়া কতগুলি সংগীত হইল!

দশটা বাজিয়া গিয়াছে, আহারের সময় উত্তীর্ণ হইয়া যায় দেখিয়া লিও পিয়ানোর ডালা বন্ধ করিয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল; তখন সকলে চিনিল, লিও! মেরি যখন চিনিতে পারিল, তখন সে টলিতে টলিতে একটা কক্ষে প্রবেশ করিয়া শুইয়া পড়িল। ক্ষণকালের জন্য তাহার চৈতন্য রহিল না। সে শুধু ক্ষণকালের জন্য। তাহার পর মেরি উঠিয়া বসিল, আপনাকে সামলাইয়া ভোজনকক্ষে উপস্থিত হইল: চতুর্দিকে চাহিয়া দেখিল সকলে একত্রিত হইয়াছে কিন্তু লিও নাই। সেই কথাই সকলে বলাবলি করিতেছিল, মেরি আসিবামাত্র সকলেই এ প্রশ্ন করিল;—মেরি ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'জানি না।' সকলকে জিজ্ঞাসা করা হইল, কেহই জানে না। অবশেষে দ্বারবান সংবাদ দিল—লিও চলিয়া গিয়াছে।

কেহই কারণ বুঝিল না, কিন্তু কথাটা সকলের মনেই খট করিয়া বাজিল। লজ্জায় ও অভিমানে মেরি দন্তে ওষ্ঠ চাপিয়া রক্তাক্ত করিল।

সে অনিমন্ত্রিত অযাচিত আসিয়াছিল। মেরির জন্মদিন উপলক্ষে প্রতি বৎসরই আসিত, আজও তাহাই আসিয়াছিল; নিমন্ত্রণের অপেক্ষা করে নাই। আজিকার দিনে না আসিলে এত আনন্দ কতকটা নিরানন্দে পরিণত হইত। মেরির মান বজায় রাখিয়া সকলকে নিরতিশয় সুখী করিয়া নিঃশব্দে সরিয়া পড়িয়াছে। দুটো ধন্যবাদ, দুটো কৃতজ্ঞতার কথা, কিছুরই অবকাশ দেয় নাই; নীরবে গৃহকর্ত্রীকে সহস্র অপরাধী করিয়া চলিয়া গিয়াছে, তাই মেরি গুপ্ত অবমাননায় ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল।

সংগীতশাস্ত্রের প্রথম অক্ষরের সহিতও যে লিওর পরিচয় আছে—এতদিনের ঘনিষ্ঠ আলাপেও মেরি তাহা জানিতে পারে নাই, তাই তাহার

কণ্ঠস্বর চিনিতে পারিল না। যখন চিনিল তখন তাহার চৈতন্য লুপ্ত হইয়া আসিতেছিল,—তাহার পর এই নীরব প্রচ্ছন্ন অবমাননা। যাতনার তাড়নায় সে-রাত্রের জন্য মেরি চক্ষু মুদ্রিত করিতে পারিল না।

॥ আট ॥

আরও তিন দিন নিঃশব্দে অতিবাহিত হইয়া গেল। এইবার, এতদিন পরে লিওর চক্ষে খুব বড় দু ফোঁটা জল আসিয়া পড়িল। আজ মাসাধিক কাল হইল মেরি অল্পে অল্পে সরিয়া দাঁড়াইয়াছে, সামর্থ্যানুযায়ী অবহেলা তাচ্ছিল্য করিতে ত্রুটি করে নাই, কিন্তু এতদিন পরে অবমাননা করিয়াছে। সে যে আত্মসম্মান তুচ্ছ করিয়া অনাহূত অতিথি হইতে গিয়াছিল এবং তাহার পরিবর্তে অবজ্ঞার মৌন জ্বালাটুকু লইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে, এইটাই তাহাকে অধিক বিচলিত করিয়া ফেলিয়াছে। তিন দিন অতিবাহিত হইল, সে একবার আসিল না, একবার ডাকিল না, আর চোখের জলের অপরাধ কি? কিন্তু শুধু কি তাই? লিওর অন্তরের ভিতর হইতে একটা ধিক্কার উঠিয়াছে। পরে দুঃখ দিলে চোখে জল আসে, কিন্তু সেজন্য আপনাকে কেহ ধিক্কার দেয় না, বরং নিজেকে একটু উচ্চ স্থানে দাঁড় করাইয়া একটু সন্তনা পাইবার চেষ্টা করে। অদৃষ্টকে দোষ দিয়া, কর্মফলের নিন্দা করিয়া, পরের মন্দ চরিত্রকে গালি পাড়িয়া অনেকটা শান্ত হওয়া যায়; কিন্তু যাহার আপনাকে আপনি ধিক্কার দিতে ইচ্ছা হয়—তাহার দুঃখ রাখিবার স্থান নাই, তাহার সান্ত্বনা এ জগতে আছে কিনা বলিতে পারি না। লিওর একফোঁটা অশ্রু মেরির জন্য পড়িয়াছিল, কিন্তু শেষ ফোঁটাটি যখন চক্ষু ছাপাইয়া গণ্ড বাহিয়া বক্ষে আসিয়া পড়িল, তখন তাহার হৃদয়ের প্রতি গ্রন্থিগুলি শিথিল হইয়া যাইবার মত হইল। এ অশ্রু তাহার নিজের জন্য পড়িয়াছে।—সকলের এমন দুর্ভাগ্য ঘটে না, ঘটিলেও হয়ত বুঝিতে পারে না, কিন্তু যদি কখন কেহ বুঝিতে পারে, তাহা হইলে সে লিওর মত নিশ্চয়ই যুক্তকরে ঊর্ধ্বমুখে কহে, 'ভগবান, এমন অশ্রুপাত কাহাকেও করাইও না।'

এক মাস হইতে লিওর অন্তরে সুখ নাই, কিন্তু সম্মান ছিল,

আত্মগৌরব তাহাকে পর্বতের মত অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিল। কিন্তু আজ সে প্রথম দেখিয়াছে যে, তাহারই আত্মগৌরব তাহাকে প্রতারিত করিয়াছে, আত্মা বিদ্রোহী হইয়াছে, মন বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে। মেরিকে সে ভালবাসিত, কারণ মেরিও তাহাকে ভালবাসিত; এটা বেশ কথা; তার পর সে রাগ করিল, কথা না শুনিয়া অবাধ্য হইয়া পড়িল, আর তাহার ভালবাসা নাই—লিও মনে স্থির করিল সেও আর বাসিবে না, তবে একটা পদার্থকে এতদিন পরে বিনাশ করিতে হইলে ক্লেশ বোধ হয়, লিওরও ক্লেশ বোধ হইয়াছিল, কিন্তু সে যুক্তি ও বুদ্ধির দ্বারা নির্ণয় করিল যে, স্ত্রীচরিত্র সহজে বুঝা যায় না, মেরিকেও সে এজন্য বুঝিতে না পারিয়া ভুল করিয়া ফেলিয়াছিল, যাহা হউক এখন সংশোধন করিলেই হইবে। সে আপনাকে শোধরাইয়া লইল, তবে মধ্যে মধ্যে দুঃখ হয়, মধ্যে মধ্যে হাসিও পায়, এমন হইয়াই থাকে, এজন্য কোন ক্ষতি নাই। সে আপনাকে সংযত করিয়া, জগতের যাবতীয় দুর্ভাবনা, দুঃখ, ক্লেশ দূর করিয়া দিয়া, পরম আনন্দে সমস্ত অন্তরাত্মা এই পুস্তকখানির উপর ন্যস্ত করিয়া হৃষ্টচিত্তে 'ইভা'র চরিত্র গড়িতেছিল। লিখিয়া শেষ করিতে পারিতেছিল না—গুণের কথা লিখিতে বুঝি স্বর্গও ফুরাইয়া যাইবে. রূপের মাধুরী বর্ণনা করিতে বুঝি স্বয়ং সজীব প্রকৃতিদেবীকে টানিয়া আনিয়া ইভার চতুর্দিকে জড়াইয়া দিতে হইবে; তাহার হৃদয়ের প্রবৃত্তিগুলি আঁকিবার আনন্দে লিওর আহার-নিদ্রা ত্যাগ হইয়াছিল, এই এক মাস ধরিয়া দারুণ পরিশ্রমেও এক তিল ক্লান্তি বোধ করে নাই, তথাপি এ চিত্র শেষ হইতেছে না, মনে হয় যদি অব্যক্ত, অজানিত দুটো কথা কেহ বলিয়া দিতে পারিত—সে দেবী-হৃদয়ের গোটা-দুই গুপ্তকথা কিছুতেই বুদ্ধিতে আসিতেছিল না, তাহা যদি পরিস্ফুত হইত তাহা হইলে এ স্বর্গচিত্র কোন স্বর্গীয় দেবীর হস্তে পরমানন্দে সমর্পণ করিয়া লিও তাহার এ জীবনের সমস্ত বাসনা, সমস্ত আশা কাগজ কলম যাহা কিছু আছে সমস্তই উৎসর্গ করিয়া নিতান্ত নিশ্চিত মনে বাকী জীবনটা চুপ করিয়া বসিয়া কাটাইয়া দিতে পারিত। আজ প্রাতঃকাল হইতে লিও এই লিখিত চিত্রখানি ভাল করিয়া দেখিতেছিল;

সহসা মনে হইল, লোকটিকে যেন সে কোথায় দেখিয়াছে, যেন এ দেবী প্রতিমার সহিত কখন কোন স্বপ্নরাজ্যে দেখাশুনা হইয়াছিল, একটু বোধ হয় পরিচয় হইয়াছিল, কিন্তু সে আর নাই, দেখাশুনা হইলে হয়ত বা চিনিতে পারা যায় কিন্তু মুখখানি মনে পড়িতেছে না। প্রাতঃকাল হইতেই সে এ কথা ভাবিতেছিল।

এখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে, আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে, বাগান ফুলের গন্ধে ভরিয়া উঠিয়াছে—লিও তাহার মধ্যে বসিয়া। দুই ফোঁটা অশ্রুর শেষ বিন্দুটি এখনও গণ্ড ছাড়ায় নাই—বুকের উপর হয়ত এইবার পড়িবে। লিও ভূমিতলে লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিয়া বলিল, 'ভগবান! এত পরিশ্রম করিয়া কি শেষে মেরির চিত্র অঙ্কিত করিয়াছি? দিবানিশির এই গভীর একান্ত চিন্তা, আকাঙ্ক্ষা, বাসনা, আনন্দ, আশা, ভরসা কি সব মেরির পদতলে লুটাইয়া দিয়াছি? কি করিতে কি করিয়াছি, ভগবান! লাঞ্ছিত, উৎপীড়িত, অবমানিত—আমাকে কি শেষে মেরির চিরদাস করিয়া দিয়াছ? হৃদয়, মন, চিন্তাশক্তি, কল্পনা—সমস্ত অযাচিত তাহাকে দিয়া আমি কি শূন্যগর্ভ জড় পুতুলের মত হইয়াছি? সে চাহে না, আমি চাই। সে পদদলিত করিয়া চলিয়া যায়, আমি ধূলার মত পদতল জড়াইয়া আছি। ছুটিয়া আসিয়া লিও গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল।

নয়

এক সপ্তাহও অতিবাহিত হয় নাই, মেরি চার্লসকে হঠাৎ বলিল, 'তুমি আমার একটা উপকার করিতে পারিবে?' আজ মেরির চক্ষু দুটা কতকটা উন্মাদের মত চকচক করিতেছে।

চার্লস কহিল, 'কি রকম উপকার?'

মেরি একটু থামিয়া বলিল, 'তবে শোন, তোমাকে বুঝাইয়া বলি; —আমার বুকের মাঝখানে একটা ছোট্ট, অতি ক্ষুদ্র কাঁটা ফুটিয়াছে। বাহির হইতে দেখা যায় না, বড় ভিতরে প্রবেশ করিয়া সর্বদা খচখচ করিতেছে—এক বিন্দুও সুখ পাই না; তুমি তুলিয়া দিতে পারিবে?'

চার্লস—ভাবিল কি রকম! বলিল, 'কেমন করিয়া কবে ফুটিল?'

মেরি মুখ টিপিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিল, 'তাও শুনিবে? শোন, কিন্তু বোধ হয় বুঝিতে পারিবে না। ছেলেবেলায় একটা গোলাপ ফুল লইয়া খেলা করিতাম, তাতে একটা কাঁটা ছিল—দেখিতে পাই নাই। তার পর মনে হয় কোনদিন বুঝি ঘুমের ঘোরে বুকে চাপিয়া ধরিয়াছিলাম—কাঁটাটি ফুটিয়া গিয়াছে। ফুল শুকাইয়া ঝরিয়া গিয়াছে—এখন কাঁটাটি বাহির করিয়া ফেলিতে চাই,—তুমি পারিবে?'

চার্লস কিছুই বুঝিল না। মন-রাখাগোছ কহিল, 'বোধ হয় পারিব, কিন্তু কাঁটা খুব ছোট ত?'

'হ্যাঁ, খুব ছোট কিন্তু সাবধান, অনেকখানি বুকের রক্ত মাংস না কাটিলে আর বাহির হইবে না। হয়ত বা প্রাণে বাঁচিব না—সাবধানে তুলিবে ত?'

চার্লস ভয় পাইল। কহিল, 'তবে ডাক্তার ডাকাও।'

মেরি হাসিল। বলিল, 'ডাক্তার ডাকিতে লজ্জা বোধ হইবে—বুকের মাঝে কিনা—তাই!'

চার্লস চিন্তা করিয়া কহিল, 'আমি বোধ হয় পারিব না।'

মেরি ভ্রূকুঞ্চিত করিল—'যদি পারিবে না, তবে মনে মনে লুকাইয়া আমাকে কামনা কর কেন?

চার্লস শুকাইয়া উঠিল। কিন্তু পরক্ষণেই এদিক-ওদিক চাহিয়া দেখিল ঘরে অপর কেহ নাই; একটু সাহস হইল, বলিল—'তোমাকে দেবতাও কামনা করেন—আমি ত সামান্য মনুষ্যমাত্র!

মেরি অন্যমনস্কভাবে কহিল, 'কিন্তু একজন আমাকে কামনা করে না। সে বোধ হয় দেবতারও উচ্চে।' তাহার পর অন্য ভাবোদয় হইল। অমনি কঠিন কটাক্ষে চার্লসের পানে চাহিয়া বলিল, 'দেখ, সে কাঁটাটি যদি একবার হাতে পাই, তা হলে এমনি করিয়া পদাঘাত করি—একফোঁটা কাঁটা নিমেষে পরমাণু হইয়া যায়, কিন্তু হাতে পাই না,—বুকের ভিতর লুকাইয়া বসিয়া আছে।'

চার্লস বিস্মিত হইয়া চাহিয়া রহিল। মনে হইতেছে—বুঝি ঠিক কাঁটার কথা নহে, কিন্তু ভাল পরিষ্কারও হইতেছে না। সাতপাঁচ ভাবিয়া কহিল, 'ডাক্তার দেখাইলে হানি কি?'

মেরি প্রথমে হাসিয়া ফেলিল কিন্তু পরক্ষণেই মলিন হইয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, আমার যেমন পোড়া কপাল, তাই তোমাদের সঙ্গে কথা বলি—সোনার পাত্র ছাড়িয়া আমি মাটির পাত্র লইয়াছি। তৃপ্তি হইবে কেন?'

চার্লসের রাগ হইল কিন্তু ভয়ে ভয়ে চুপ করিয়া রহিল।

মেরি তাহা দেখিয়া মনে মনে হাসিল, মনে মনে কহিল, 'এরা আমাকে কত ভয় করে।'

সেদিন সমস্ত দুপুরবেলা সে ঘরের কোণে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। রাত্রে শয্যার উপর জাগিয়া পড়িয়া রহিল। প্রভাতে কোচম্যানকে ডাকাইয়া বলিল, 'গাড়ি সাজাও—মিঃ বাথের বাড়ি যাইব।'

মিঃ বাথ ক্যাপ্টান নোলের এটর্নি। মেরি দ্বারে গাড়ি দাঁড় করাইয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। বৃদ্ধ বাথ একরাশি কাগজপত্র টেবিলে রাখিয়া কাজ করিতেছিল। মেরিকে সহসা অফিসে দেখিয়া অভিবাদন করিয়া উপবেশন করাইয়া বলিল, 'এত সকালে?'

'কাজ আছে। কর্ণেল হ্যারিংটন আমার পিতার নিকট কত টাকা কর্জ লইয়াছিল?'

মিঃ বাথ খাতাপত্র দেখিয়া হিসাব করিয়া বলিল, 'আট হাজার পাউণ্ড।'

'বেশ! সুদে-আসলে আজ পর্যন্ত তাহা কত হয়, শীঘ্র হিসাব করিয়া দাও।'

সে হিসাব করিয়া বলিল, 'আজ পর্যন্ত প্রায় বারো হাজার দুই শত পাউণ্ড হয়।'

মেরি দন্তে দন্ত টিপিয়া বলিল, 'খুব ভাল, জোঁক যেমন রক্ত শুষিয়া লয়, তেমনি করিয়া হিসাব করিয়াছ ত?'

বৃদ্ধ ভয় পাইল—বলিল, 'হাঁ, সেই মত!'

'আজ হইতে সাত দিনের মধ্যে আমার এই টাকা চাই—বুঝিলে?'

বৃদ্ধ অবাক হইয়া গেল। 'এ কি কথা? সাত দিনের মধ্যে এত টাকা কে দিবে?'

মেরি চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া বলিল, 'তাহার পুত্র দিবে। না পারে—

তাহার বাটী ঘর দ্বার সমস্ত বিক্রি করিয়া লইব।'

বৃদ্ধ ভাবিল, ভিতরে কিছু ঘটিয়াছে; তথাপি বলিল, 'এই সেদিন পুস্তক বিক্রয় করিয়া আমার নিকট দু হাজার পাউণ্ড জমা দিয়া গিয়াছে। আর তাহার কিছু নাই। সেদিন বলিয়াছিল যে, সম্ভবতঃ আর দুই তিন বৎসরের মধ্যে বাকী টাকা পরিশোধ করিবে। কিন্তু এত তাড়াহুড়া করিলে তাহার বাটী বিক্রয় ভিন্ন অন্য উপায় নাই।'

মেরি আগ্রহের সহিত বলিল, 'বাটী বিক্রয় হইবে?'

'বোধ হয়।'

'হয় হউক—উত্তম কথা। আমার টাকা চাই। সাত দিনের মধ্যে—না হয় নালিশ করিও।'

বৃদ্ধ অনেক দেখিয়াছে কিন্তু এমনটি দেখে নাই। বলিল, 'এত অল্প বয়সে তাহাকে পথের ভিখারী করিবে? কাহাকে দেশত্যাগী করা উচিত কি?'

মেরি চক্ষু রাঙ্গাইল। 'টাকা তোমার নয়, আমার। আমি তাহাকে পদতলে টানিয়া লইতে চাই।'

শেষ কথাটা বৃদ্ধ ভাল শুনিতে পাইল না, বলিল, 'কি করিতে চাও?'

'কিছু না। শুধু টাকা চাই। আজ নোটিশ দাও—ঠিক সাত দিনের দিন।'

দশ

নোটিশ পাইয়া লিওপোল্ডের সমস্ত সংসার অন্ধকার বোধ হইল। সমস্ত রাত্রি চিন্তা করিয়াও সে কুল দেখিতে পাইল না।

প্রাতঃকালে, মেরি আপনার কক্ষে বসিয়া রক্তবর্ণ চক্ষু নত করিয়া কি ভাবিতেছিল, এমন সময় ভৃত্য আসিয়া কহিল, 'নীচে লিও দাঁড়াইয়া আছে।'

মেরি মুখ তুলিয়া বলিল, 'কে?'

'লিও।'

'দূর করিয়া দাও।' ভৃত্য ভাবিল মন্দ নয়। সে চলিয়া যাইতেছিল

—মেরি তাহাকে ডাকিয়া কহিল,—'দাঁড়াও, দূর করিয়া দিও না। সে বড় অভিমানী—অপমান সহিতে পারে না—মিষ্টি কথায় যাইতে বলিও। বলিও, আমি বাড়ি নাই ;—দেখিয়ো কিছুতে যেন সে মনে ক্লেশ না পায়, কিছুতে যেন সে বুঝিতে না পারে আমি ইচ্ছাপূর্বক দেখা করিলাম না। বুঝিলে ?'

ভৃত্য ঘাড় নাড়িল। সে লিওকে খুব চিনিত,—বাটীর সকলেই চিরকাল তাহাকে সম্মান করিয়াছে ; মেরি আজ্ঞা করিলেও কেহ তাহাকে অপমান করিতে পারিত না। সে নীচে চলিয়া গেল।

নিঃশব্দ পদক্ষেপে মেরি ভৃত্যের পশ্চাতে নামিয়া আসিল। ঈষৎ উন্মোচিত দ্বারের অন্তরাল হইতে দেখিল, লিও দাঁড়াইয়া আছে। মুখ বড় শীর্ণ, যেন কিছু পীড়িত ; ভৃত্য কহিল, 'তিনি বাটী নাই।'

'কোথায় গিয়াছেন ?'

ভৃত্য বুদ্ধি করিয়া বলিল, 'কাল রাত্রে লণ্ডন গিয়াছেন।'

'কবে আসিবেন ?'

'জানি না। বোধ হয় কাল।'

নিকটস্থ একটা চেয়ারের উপর লিও বসিয়া পড়িল। শরীর নিতান্ত পরিশ্রান্ত বোধ হইতেছিল।

ভৃত্য তাহা অনুমান করিয়া বলিল, 'বসুন। আপনাকে বড় ক্লান্ত বোধ হইতেছে। এক গ্লাস বিয়ার আনিয়া দিব কি ?

লিও বলিল,' না।'

ভৃত্য ছাড়িল না। বলিল, শরীর অসুস্থ বোধ হইতেছে। বিয়ারে উপকার হইবে।'

লিও অল্প হাসিয়া ধন্যবাদ দিয়া কহিল, 'আমার দুই দিন হইতে জ্বর হইয়াছে, দুই দিন উপবাসী আছি—তাই এমন বোধ হইতেছে।'

এই সময় কবাট-জোড়াটা খুব দুলিয়া শব্দ করিয়া উঠিল। লিও চাহিয়া দেখিল—'ও কি !'

ভৃত্যও চাহিল—'বোধ হয় বাতাস।'

মেরি পা টিপিয়া দ্রুতপদে পলাইয়া গেল।

এই গ্রামে টমাস হগ বলিয়া একজন মহাজন বাস করিত। লিওপোল্ড বরাবর তাহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। ডাকিয়া বলিল, 'হগ, আমার বাটী বিক্রয় হইবে, তুমি কিনিবে?'

হগ বিস্মিত হইয়া বলিল, 'বাটী বিক্রয় করিবে? কেন?'

'সে কথা না শুনিলে কিনিবে না?'

'নিশ্চয় নয়। কিন্তু কত টাকায় বিক্রয় করিবে?'

'তের হাজার পাউণ্ড পাইলেই বিক্রয় করিবে।'

'এত টাকা? কি প্রয়োজন?'

বলিতেছি। পিতা Captain Noll-এর নিকট আট হাজার পাউণ্ড লইয়া বাটী বন্ধক রাখিয়াছিলেন। সুদে-আসলে তাহা প্রায় চৌদ্দ হাজার হইয়াছে। দুই হাজার পাউণ্ড পরিশোধ করিয়াছি—আর বার হাজার বাকী আছে। তাহাই পরিশোধ করিতে চাই।'

Thomas Hogg মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। 'উঃ,—তাঁহারা দুজনে বিশেষ বন্ধু ছিলেন, তবুও এত সুদ! আমরাও যে এত লই না।'

লিও উত্তর দিল না। বলিল, 'কিনিবে?

'কিনিতে পারি, কিন্তু অত টাকা দিতে পারি না। বার হাজারের বেশি কিছুতেই নয়।'

লিও চিন্তা করিয়া বলিল, 'আমার অনেক আসবাব আছে—তা' ছাড়া এক ঘর পুস্তকও আছে—সমস্ত লইয়াও কি তের হাজার দেওয়া যায় না?'

হগ কহিল, 'যায়। কিন্তু বাটী বন্ধক আছে—তুমি যে টাকা পরিশোধ করিবে, তাহার প্রমাণ কি?

লিও হাসিল। 'আমাদের বংশে কেহ চুরি করে নাই—আমিও চোর নহি। তোমার বিশ্বাস না হয়, আমার সহিত এস, বণ্ড তোমার হাতে দিব।'

হগ বিশ্বাস করিল। সমস্ত টাকা দিয়া গুণিয়া বলিল, 'কাল রেজেষ্ট্রি করিয়া দিও—কিন্তু এক কথা বলি, যদি কখন তোমার টাকা সংগ্রহ হয় আমার নিকট আসিও, তোমার বাটী তোমাকেই ফিরাইয়া দিব।'

সে রাত্রে লিওর পুরাতন ভৃত্য দুইটি বড় বেশী রকম কাঁদিতে লাগিল। আকস্মিক এরূপ সংবাদে তাহাদের মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল। প্রত্যেকে ছয় মাসের করিয়া অধিক বেতন পুরস্কার পাইয়াছে, তথাপি কাঁদিতে ছাড়িল না। আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি গুছাইয়া বাঁধা হইল, বাকী যাহা রহিল, হুকের লোক তাহা বুঝিয়া লইল। কাল সপ্তদিন পূর্ণ হইবে, পিতৃঋণ পরিশোধ করিয়া লিও কাল জন্মের মত কোরেল গ্রাম ছাড়িয়া যাইবে, চিরপুরাতন ভৃত্যেরা তাই কাঁদিয়া শেষ করিতে পারিতেছে না। লিও তাহাদিগকে সান্ত্বনা দিতেছে—যদি বাঁচিয়া থাকি দুই বৎসরের মধ্যে আবার আমার কাছে আসিতে পাইবে। লিওকে তাহারা বাল্যকাল হইতে সত্যবাদী বলিয়া বিশ্বাস করিত—সেইজন্য কতক শান্ত হইয়াছে।

লিও ভাবিতেছে—জনক-জননীর মুখ, মেরি, তাহার জননী, পুস্তকের রাশি, ফুলের বাগান তাহার চির সহচর ঐ ক্ষুদ্র পাঠাগার—আর ভাবিতেছে মেরি তাহাকে গৃহত্যাগী করিয়াছে।

দুশ্চিন্তা ও নানা কারণে সে রাত্রে তাহার প্রবল জ্বর বোধ হইল। সমস্ত রাত্রি একরূপ অচৈতন্য অবস্থায় কাটিল—দ্বিপ্রহরের পর জ্বরত্যাগ হইল, কিন্তু শরীর নিতান্ত দুর্বল। সামান্য হিনিসপত্র যাহা সাথে লইয়াছিল তাহা স্টেশনে পাঠাইয়া দিয়া নোটের তাড়া হাতে লইয়া মেরির গৃহে উপস্থিত হইল।

মেরি উপরে বসিয়া ছিল, ভৃত্য সংবাদ দিল, 'লিও টাকা লইয়া আসিয়াছে।' মেরি Bond লইয়া নীচে নামিয়া আসিল। কিন্তু টাকার কথায় সে আদৌ বিশ্বাস করে নাই, এবং এজন্য আপনাকেও প্রস্তুত করে নাই; সমস্ত দিন ধরিয়া সে এইরূপ একটা কল্পনা করিতেছিল, সে ভাবিতেছিল আজ তাহার চিরবাঞ্ছিত ধরা দিবে, আজ তাহার উচ্ছৃঙ্খল অতৃপ্তি পদতলে লুটাইয়া পড়িবে। তখন সে কি করিবে, কেমন করিয়া আপনার গাম্ভীর্য বজায় রাখিয়া সে সময়ের প্রবল ঝঞ্ঝাবায়ু মাথায় পাতিয়া লইবে, তাহাই স্থির করিয়াছিল। ঋণ পরিশোধ করিয়া লিও যে তাহাকে জন্মের মত পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারে, এ

দুরদৃষ্টের এক বিন্দুও তাহার মনে উদয় হয় নাই। লিও তাহার বশ্যতা স্বীকার করিবে, কেননা সবাই করিয়াছে। এতদিন যে করিতেছিল না সে কেবল তাহার মূর্খতার ফল।

মেরি উপায়সিদ্ধির জাল বুনিতেছিল, কিন্তু এতদিন তাহা পারিয়া উঠে নাই,—এক দিক বুনিতে অন্য দিকের সূতা ছিঁড়িয়া যাইতেছিল। কিন্তু এতদিনে দুই দিকে বেশ শক্ত করিয়া বাঁধিয়া চমৎকার জাল তৈয়ার হইয়াছে, এবার শিকার ধরা পড়িবেই।

কতকটা হৃষ্টচিত্তে মেরি নামিয়া আসিল। বসিবার কক্ষে লিও দাঁড়াইয়াছিল। আসিয়াই দেখিল তাহার হাতে একতাড়া নোট রহিয়াছে, মেরি কাঠের মত হইয়া গেল। লিও হাসিয়া হস্তগ্রহণ করিল। মেরি মুখ অবনত করিল। মনে হইল হাত বুঝি বড় উষ্ণ, আর এ হাসি বুঝি উপহার দিবার জন্য কাহারো নিকট চাহিয়া আনিয়াছে।

লিও কহিল, 'টাকা নাও। আজ সাত দিনের শেষ দিন।'

মেরি হাত পাতিল। লিও একে একে নোটের তাড়া গুনিয়া দিয়া বলিল, 'হইয়াছে?'

মেরি পূর্বের মত মাথা নাড়িয়া Bord ফিরাইয়া দিল। একমুহূর্তে তাহার সমুদয় কৌশল, আশা, ভরসা সমস্ত ফাটিয়া গিয়াছে—ভিতরের হৃৎপিণ্ডও ফাটিবার উপক্রম করিতেছে, শরীরের সমস্ত শক্তি একত্রিত করিয়া এ সময়ে সে প্রাণপণে সচেতন রহিল; এ সময়ে অচেতন হইলে চলিবে না।

লিও কহিল, 'আজ বোধ হয় এই শেষ। শেষ সময়ে তোমাকে দুটো কথা বলিতে চাই, শুনিবে কি?'

মেরি মাথা নাড়িয়া বলিল, 'শুনিব।'

'তবে এ কথাটি রাখিও। কাহাকেও সৎ দেখিয়া শীঘ্র বিবাহ করিও; তোমার অর্থ আছে—অর্থের জন্য ভাবিও না; শুধু সৎ এবং উচ্চ দেখিয়া কাহাকে বিবাহ করিয়া সুখী হইয়ো;—এরূপ ধনসম্পত্তি লইয়া অরক্ষিতা অবস্থায় বেশি দিন থাকিয়া না।'

মেরি একটিবার মাত্র মুখ তুলিয়া লিওর মুখপানে চাহিয়া অবনত হইল।